শান্তির স্বাক্ষর

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী
১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট · কলকাতা · বারো ·

অগ্রজপ্রতিম

শ্রীকেশবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীপ্রাণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীহরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ—

পথ (নাটক)
জনপদবধূ
নীলাঞ্জনছায়া
শ্বেত কপোত
দুই নদী
তীরভূমি
দেবকন্যা
সিন্দুর টিপ্‌
নীলসিন্ধু
মধ্যদিনের গান
কত আলোর সঙ্গ
এই তীর্থ
এক আশ্চর্য মেয়ে
একটি রঙ-করা মুখ
এ-জন্মের ইতিহাস
বিদিশার নিশা
নতুন নাম নতুন ঘর
স্বপ্নসঞ্চার
সীমাস্বর্গ
জলকন্যার মন

বয়সটা চল্লিশের বড়ো স্টেশন ছুঁয়ে আবার যখন চলা শুরু করল, তখন মনে হলো, এর পাইলট বদলে গেছে, এর ইঞ্জিন বদলে গেছে, এর গার্ড বদলে গেছে, এমন কি এর লাইনও বদলে গেছে! বড়ো লাইন থেকে ছোট লাইনে এসে পরিবর্তন করেছি বাষ্পীয় রথ, চলার গতিতে সেই বেগও নেই, সেই সমারোহও নেই!

দীর্ঘ দশটা বছর একটানা ভ্রাম্যমাণ রেলকর্মচারী-রূপে জীবন কাটাতে হয়েছে বলে কথায়-বার্তায় চিন্তায়-ভাবনায় বারবার চলমান বাষ্পীয় সরীসৃপটির উপমা এসে পড়ে। সেই, সিগন্যাল পড়েনি বলে অন্ধকার রাত্রে হঠাৎ থেমে গিয়ে মুহুর্মুহুঃ চীৎকার করা, সেই, চলতে চলতে ঘটাং ঘটাং করে হঠাৎই গতিপথের পরিবর্তন,—সবই আজ জীবনের ক্ষেত্রে উপমা হিসাবে ব্যবহার করতে ইচ্ছা করে। অথচ, এই পাঁচ বছর রেলের আমি কে?

কেউ না! পঁচিশ বছর বয়সে সুপারিশের জোরে চাকরী পাওয়া, ট্রেনের কামরায় টিকিট চেক করে বেড়ানো, সে সব ত দশ বছর চাকরী করার পর শেষ হয়ে গেছে! পঁচিশে আরম্ভ, পঁয়ত্রিশে শেষ। বাকী এই পাঁচ বছর ধ'রে আমি ত অন্য জগতের লোক, অন্য দিগন্তের, অন্য কর্মচক্রের! ভাবতে আশ্চর্য লাগছে, পঁয়ত্রিশের সেই বিবর্তনকালে আমার ত ঘুণাক্ষরেও মনে হয়নি, আমার জীবনটা এক বিপুল পরিবর্তনের স্রোতে ভেসে চলতে শুরু করেছে! অথচ, আজ, যখন আমি পঁয়ত্রিশ-বছর-বয়সে-যোগদান-করা সেই কর্মচক্রেই যুক্ত আছি, মাত্র স্থান-পরিবর্তন ছাড়া নূতনতর আর কোন ঘটনাই ঘটেনি, তখন, হঠাৎ কেন আজ মনে হতে শুরু করেছে, আমার সব কিছুই বুঝি আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেল? তবে কি জীবনে চল্লিশ পেরিয়ে যাওয়া এক বিশেষ স্বাদের দ্যোতক?

আসলে আমার মনটা গতিশীল। মন সবারই গতিশীল, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যাবার প্রয়াস মনের ধর্ম, নানান আকারে, নানান বিকারে মনের সেই সঞ্চরণশীলতা বেশ অনুভব করা যায়। কিন্তু, আমার মনের এই গতিশীলতার মধ্য দিয়ে আমি এক স্বাতন্ত্র্য খুঁজে পাচ্ছি। হয়ত এ চিন্তাটাও নিছক বিলাসেরই নামান্তর, তবু নিজের স্বাতন্ত্র্যের কথা নিজের মনে এই ভাবে ভেবে যেতে অদ্ভুত লাগে! পঁচিশ বছর বয়সে সেই যে জীবনে লেগেছিল ইঞ্জিনের টান, পঁয়ত্রিশে সে টান আপাত দৃষ্টিতে শিথিল হয়ে খ'সে পড়লেও শেষ হয়নি। এই যে তামাক-কোম্পানীর প্রতিনিধি হয়ে দেশ-দেশান্তর ঘুরে বেড়াচ্ছি, এই ঘোরার পিছনে সেই নিদারুণ টানই কাজ করে চলেছে! কতো মানুষের সঙ্গে মিশেছি, কতো আলাপ পরিচয়, কতো বন্ধুত্ব, আবার এক সময় দেখি, সে সব পরিচয়ের সূত্র নির্মমভাবে ছিঁড়ে ফেলে এগিয়ে গেছি নূতনতর বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে! প্রথম চাকরীর প্রথম পর্যায়ে যখন কাজ নিয়ে মেতে গেলাম, তখন বই পড়ার নেশা আমার একেবারেই ছিল না, পড়তে গেলে মাথা ধরত বললেও চলে। তাস খেলতাম প্রচুর, কিছুদিনের মধ্যেই ব্রীজ খেলার এক নামকরা লোক হয়ে উঠে-ছিলাম আমি। কিন্তু বছর পাঁচেক পরে হঠাৎ চলে গেল তাসের নেশা, তখন দাবা খেলায় পারদর্শী হয়ে উঠেছি, আর, সিগারেট। মুহুর্মুহুঃ সিগারেট না হলে আমার চলত না।

কাটলো আরো পাঁচ বছর। অমন চাকরী যখন হুট্ করে হঠাৎ ছেড়ে দিলাম, আত্মীয়-স্বজন যখন ছি ছি করতে লাগল, তখন কোথায় গেল দাবা আর সিগারেট! এই পাঁচ বছর মাঝে মাঝে নস্যি ব্যবহার করেছি, আর খবরের কাগজ পড়ে পরিচিতদের সঙ্গে বিশ্ব-রাজনীতি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করেছি!

কিন্তু, আজ? সিগারেট নেই, নস্যি নেই, তাস-দাবা-খবরের কাগজ নেই, আমি যেন এক অন্য বিশ্বে এসে উপনীত হয়েছি!

পঁচিশ বছর বয়সে সেই যে রেলের চাকরীতে ঢুকেছিলাম, তার

ছ'সাত মাস পরে হঠাৎ আমার এক বিয়ের সম্বন্ধ এসেছিল। সাত ভাই তিন বোন নিয়ে মধ্যবিত্ত বাপ-মায়ের যে বৃহৎ সংসার, সেই সংসারের আমি একজন, দাদা ও ছোট ভাইদের তুলনায় লেখাপড়ায় নিরেশ, বাউণ্ডুলে গোছের। সুতরাং, কী রকম ব্যবহারের মধ্য দিয়ে যে মানুষ হয়েছি, তা সহজেই অনুমেয়। তিন বোনের মধ্যে এক বোন বড়ো, দু'বোন ছোটো। সব থেকে ছোটটির নাম অতসী, সেই অতসীরই বন্ধু,—মাধুরী। অতসীর কাছে কতোবার যে তার নাম শুনতাম তার ইয়ত্তা নেই, বলতো—অমন মেয়ে হয় না, তুমি বিয়ে করবে সেজদা?

আমার বড় বোন আর বড়ো দু'ভায়ের বিয়ে হয়ে গেছে ততদিনে। বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার। আজ ভেঙে ভেঙে নানান দিকে ছিট্‌কে পড়েছে, কিন্তু বাবা-মা যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন একই সূত্র-বন্ধন ছিল আমাদের মধ্যে। অতসী যতবার এসে আমাকে সম্বন্ধের কথা বলত, আমি রেগে উঠতাম, বিরক্তি প্রকাশ করতাম, কিন্তু একদিন কী হলো, বলে উঠলাম—তোর সব খালি মুখে! একদিন ত তাকে দেখালিও না।

হেসে উঠল অতসী, বললে—তাই বলো। ইচ্ছে হয়েছে।

এবং এর দিনকয়েক পরেই, সেদিনটা আমার অফ্‌-ডে, বাড়িই আছি, অতসী করেছে কি, আঠারো উনিশ বছরের একটি নতমুখী শ্যামলী মেয়েকে টানতে টানতে নিয়ে এলো একেবারে আমার ঘরের মধ্যে। বললে—দেখ সেজদা, দুটি চোখ ভরে দেখ, এই-ই আমার বন্ধু, মাধুরী।

এ-সমস্ত ঘটনা অতি সাধারণ, অভিনবত্ব কিছুই নেই এতে। আমি যে অতো নাম-করা তাস-খেলোয়াড়, চোখে-মুখে কথা বলি, কিন্তু সেদিন কথা বলা ত দূরের কথা, মুখ তুলে ভালো করে যে মেয়েটির দিকে তাকাবো, সে সাহসও আমার হয়নি।

মেয়েটি একটু পরেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অতসীর সঙ্গে।

তারপরে, কখন যে সে চলে গেল তা-ও জানি না। আমি আমার ঘরের মধ্যে নিস্পন্দের মতো বসে ছিলাম এটুকু মনে আছে।

সে চলে যেতেই অতসী ত্বরিতপায়ে এলো আমার ঘরে, বললে—হাঁদারাম। দুটো কথা বলতে কী হয়েছিল?

আমার এই বোনটি ছিল বাড়ির মধ্যে আমার সব থেকে স্নেহের আকর্ষণ, ওর থেকে বয়সে আমি যথেষ্ট বড়ো হলেও আমাকে সমীহ করত না, কিন্তু মনে মনে ওর এই ভবঘুরে দাদাটিকে ও ভালবাসত খুব। অতসী আজ ইহজগতে নেই, কিন্তু, যখনই বাল্যের কথা ভাবতে বসি, তখনই ওকে নিয়ে নানান ঘটনা নানান ছবি মনে এসে ছায়াছবির মতো একের পর এক ভেসে যায়।

আমাকে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে দেখে, কাছে এগিয়ে এলো অতসী, বললে—এই সেজদা, বলো না, সম্বন্ধ করব?

বললাম—কোথায় থাকে রে?

—তা' দূর আছে।—অতসী বললে—কম কাণ্ড করে বাড়ি আনিয়েছি ওকে। গাড়ি করে এসেছে, দারোয়ান সঙ্গে নিয়ে। ভীষণ বড়ো লোক ওরা, যখন-তখন যেখানে সেখানে আসতে দেয় নাকি?

সবিস্ময়ে উঠে দাঁড়িয়েছি ততক্ষণে। বললাম—কী বললি। গাড়ি করে এসেছিল! বড়ো লোকের মেয়ে?

—হ্যাঁ।

—তোর সঙ্গে পড়ে বুঝি?

—পড়ত। এখন আর পড়ে না। ওরা খুব পর্দানসীন।

বললাম—ওকে তুই আমার সম্বন্ধে কী বলেছিস?

বললে—কী আবার বলব। তুমি রেলের চাকরী করো—

বলেই, একটু থেমে গিয়ে, হেসে ফেললে, বললে—রেলের চাকরীর ওপর মাধুরীর খুব ঝোঁক, জানো? আমাকে ও বলত, "আমার যে বর হবে, সে রেলের লোক হবে, বুঝলি! খুব পাশ পাবে, আর আমাকে নিয়ে দেশ বিদেশ ঘুরবে।"

রুদ্ধ বিস্ময়ে ব'লে উঠলাম—বিয়ের কথা তুলিস নি ত ওর কাছে ?

অতসী বললে—যাঃ। সে কী এখন তুলতে আছে। আমি বললাম—এই মাধুরী. আমার সেজদার সঙ্গে আলাপ করবি ? এই লম্বা-চওড়া চেহারা, রেলে চাকরী করে, কতো মজার মজার গল্প শুনবি, আয় না।

বললাম—তুই বললি, আর ও এলো ?

—ওমা, আসবে না কেন। বন্ধু বন্ধুর বাড়ি আসবে না! আমিও ত কতবার গেছি ওদের-বাড়িতে। কী আদর-যত্ন, কী খাওয়ানো-দাওয়ানো।

বলেই আবার একটু থেমে ক্ষুন্ন কণ্ঠে বলে উঠল—সে তুলনায় আমি আর ওর যত্ন করতে কোথায় পারলাম, বলো!

অতসীর কথা-বার্তার মধ্য দিয়ে ব্যাপারটা ক্রমশ স্বচ্ছ হয়ে আসছিল। বললাম— তা' আর কী করবি ? কিন্তু শোন্, মাকে বলে ফেলিসনি ত ঐসব বিয়ে-টিয়ের কথা ?

ও বললে—ওমা, তা আর বলব না। মাধুরী চলে যেতেই বললাম —মা, কেমন দেখলে আমার বন্ধুকে ? বউ করে ঘরে আনবে ?

—মা কী বললে ?

অতসী নীরস কণ্ঠে বললে,—মা বললে, অতো বড়ো লোকের ঘরের মেয়ে, আমাদের ঘরে ওকে দেবে কেন ওর বাপ-মা ?

কথাটা শুনে এতক্ষণে হল্‌কা হয়ে গেল মনটা। বললাম—ঠিক কথাই বলেছে মা। ওসব কথা নিয়ে আর আলোচনা করিসনি। তোর বন্ধুকেও কোনো কথা বলতে যাস নি।

ও বললে—বা রে, তা কি হয়। তোমাকে কেমন লাগল, ওকে জিজ্ঞোসা করবো না ?

হেসে বললাম—করে লাভ ?

ও বললে—বিয়েটা হলে বেশ হয় না ?

ওর কাঁধে হাতখানা রেখে সস্নেহে বললাম—না, বেশ হয় না। লক্ষ্মীটি বোন, এ নিয়ে আর কোনো-কিছু ভাবিস নি।

অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা। আঠারো-উনিশ বছরের এক অপরিণত-বুদ্ধি বালিকার অলস কল্পনা। মাধুরীকে জীবনে আমি আর কখনো দেখিনি, দেখবার অবকাশও আসেনি, এমন কি তার মুখখানা কেমন, আজ তা স্মরণেও আনতে পারি না, কিন্তু যার সঙ্গে তার সামান্যতম স্মৃতিটুকু বিজড়িত আছে, সেই আমার হারানো বোনটির কথা যখন মনে পড়ে, তখন তার সঙ্গে সঙ্গে সেই নতমুখী শ্যামলী মেয়েটিও বুঝি ধীরে ধীরে এসে উপস্থিত হয় আমার এই নির্জন গৃহপ্রান্তে!

উক্ত ঘটনার দিন-সাত-আট পরেই অতসী একদিন ছুটতে ছুটতে এলো আমার ঘরে আমাকে তখন ফিরতে দেখে। ধরা-চূড়ো ছাড়ছি, ওকে অমন করে আসতে দেখে সবিস্ময়ে বলে উঠলাম—কী রে?

ও বললে—চা খাবে ত?

—তা তো খাবোই, কিন্তু নিছক চায়ের কথা বলতে অমন করে কেউ ছুটে আসে না, কী হয়েছে বল্ ত?

ও বললে—গাড়ি পাঠিয়ে মাধুরী আমাকে নিয়ে গিয়েছিল ওদের বাড়ি। কতো গল্প হলো, জানো? তুমি কেন সেদিন ওর সঙ্গে কথা বললে না সেজদা?

—কেন বলত?

—ও দুঃখ করতে লাগল। বললে—"গল্প শুনব বলে গেলাম, তোমার সেজদা ত গম্ভীর হয়ে বসেই রইলেন।"

সকৌতুকে বলে উঠলাম—তারপর?

ও আমার দিকে তাকিয়ে ঝংকার দিয়ে উঠল, বলল—জানি না, যাও!

ওর কাছে এসে প্রশ্ন করলাম—বিয়ের কথা তুললি?

—তুমি চুপ করো ত সেজদা!—অতসী রাগ করে বলে উঠল—

খালি আমাকে ক্ষ্যাপাবার চেষ্টা। জানো, তোমাকে ওর খুব ভালো লেগেছে। কতো কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগল খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে।

—কী কী কথা, শুনি?

উৎসাহের সঙ্গে বলতে লাগল—ট্রেনে-ট্রেনে কতো দূরে যাও, কোন কোন দেশ ঘুরে বেড়াও, সে-সব যায়গায় লোকগুলো কেমন, এই সব নানান প্রশ্ন।

বললাম—আচ্ছা অতসী, ওর বাপ-মা বোধহয় ঘুরতে টুরতে বিশেষ যান না, না?

ও বললে—কোথায় আর যায়? ওর ঘোরার খুব সখ, বললাম না? কিন্তু, বড্ড শাসন। মেয়ে ফার্ষ্টক্লাশে উঠল, পরীক্ষা দিয়ে পাশটা করে নিক, তা না ওকে আর পড়ালো না বাপ-মা। স্কুল ছাড়িয়ে বাড়িতে বসিয়ে রাখল! কী না, বিয়ে হবে। ওর কতো দুঃখ, তা জানো?

বললাম—তাহলে বুঝছিস, তোর দাদার সঙ্গে সম্বন্ধ করা কতো বৃথা?

—কেন? —ও বললে—ওর বাপ-মা নিশ্চয়ই পাত্র খুঁজছে, পাচ্ছে মনের মতো? পেলে মাধুরী ঠিক আমাকে বল্‌ত। কে জানে কার হাতে পড়বে। আমাদের ঘরে যদি আসত! দাঁড়াও, এবার যে দিন যাবো, সেদিন সত্যিই বলে বসবো মাধুরীকে।

ওর উৎসাহের অন্ত ছিল না, আমি কিন্তু মনে মনে হাসতাম। হাসতাম বটে, কিন্তু আজ সেই হাসির কথা স্মরণ করেই বুকের ভিতরটা গুম্‌রে-গুম্‌রে উঠছে। আমার আরো ত দুটি বোন ছিল, কিন্তু এমন একান্ত করে আমাকে ভালোবাসেনি আর কেউ। অতসী ছিল সরল, অতসী ছিল কল্পনাপ্রবণ, যা সংসারে ছিল অসম্ভব, তা-ই ও সম্ভব করতে চাইত।

এরপর প্রায় মাসখানেক কেটে গেছে বোধহয়। ঘরে বসে

বসে ছুটির দিনে পেসেন্স খেলছি, ও এসে হঠাৎ পিছন থেকে চোখ টিপে ধরল। বললে—কী খাওয়াবে বলো সেজদা?

বিব্রত বোধ করে বললাম—ছাড়-ছাড়। কী হয়েছে বল।

ও আমাকে ছেড়ে দিয়ে আমার সামনে এলো, বললে—মাধুরীকে বিয়ের কথা বলেছি। জানো সেজদা, ও তোমাকে বিয়ে করবে। বললে—"আমার মা-বাবাকে বলো।"

—তারপর?

ও বললে—মাকে বলেছি। কাল-পরশু বাবা যাবেন প্রস্তাব নিয়ে।

অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। পাগল মেয়েটা বলে কী!

আজও মনে পড়ে সে-সব দিনের কথা! প্রধানতঃ আমার ক্ষ্যাপা বোনটির আবদার এড়াতে না পেরেই বোধহয় বাবা ছেলের সম্বন্ধ নিয়ে গেলেন কন্যাপক্ষীয়দের কাছে। ধনী ব্যবসায়ী ভদ্রলোক ত যাকে বলে আকাশ থেকে পড়লেন। তাঁর ভাবী জামাই আসছেন বিলেত থেকে, বিয়ের সব প্রায় ঠিকটাক, এর মধ্যে এ আবার কী অদ্ভুত প্রস্তাব এসে পড়ল তাঁর কাছে! সুতরাং, মেয়েকে ডাকাডাকি করে, বাবারই সামনে এনে তাকে বকাবকি করা,—মেয়ের কান্না,—বাবারও অপমানিত হয়ে বাড়ীতে ফিরে আসা।

সব যখন শুনলাম, তখন আমার কাছে এ কোনো বিস্ময় হয়েই দেখা দেয়নি। আমার মন যেন আগে থাকতেই জেনে বসে আছে, এই-ই ঘটবে! কিন্তু, আমার এই ব্যাপারটা নিয়ে অতসীকে যে মনোবেদনা সইতে হয়েছিল সেদিন, সেটাই হচ্ছে মর্মান্তিক।

বাবা ত তাকে বকলেনই, উপরন্তু মাধুরীর বাবা যে অতসীকে তাদের বাড়ী পর্যন্ত যেতে বারণ করে দিয়েছেন, সেটাও বিশেষ করে উল্লেখ করতে দ্বিধা করলেন না।

অতসীর কান্নার কথা জীবনে আমি কখনো ভুলব না। বালিশে

মুখ গুঁজে সেই যে উচ্ছ্বসিত হয়ে কাঁদতে লাগল, তাকে থামায় কার সাধ্য?

বাবা তাকে যতটা না ধম্‌কালেন, আমাকে বক্‌লেন তার ঢের বেশি। বাবার ধারণা হলো, এ-সব কিছু চক্রান্তের মূলে—আমি। অতসীকে দিয়ে আমিই আমার অন্তরের এক দুঃসাহসিক স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করতে প্রয়াসী হয়েছিলাম। একে ঐ রেলের সামান্য চাকরী, তারও পরে শিক্ষার দিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ পর্যন্ত নেই, এ-অবস্থায় এ-সব কল্পনাই বা করতে যাই আমি কেমন করে?

বাবা কেন, দাদা এবং ভাইরা পর্যন্ত সেদিন আমাকে তিরস্কার করতে ছাড়েননি। আমার মনে হচ্ছিল, পীড়নটা মনে নয়, শেষ পর্যন্ত দৈহিকতায় পর্যবসিত হবে। পিঠের ওপর বাবার হাতের লাঠিটা এসে পড়বে বলে প্রতিমুহূর্তে আশঙ্কা করছিলাম, কিন্তু আমার লক্ষ্মী বোনটির পুণ্যেই বোধ হয় সেটা আর হয়ে ওঠেনি!

কিন্তু, আজ বলতে বাধা নেই, সেদিনের থেকে প্রবলতর প্রহার যে ভাগ্যে ছিল, তা' আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি! যেদিন ও ঘটনা ঘটে, তার একমাস পরে আমার মেজো বোনের বিয়ে হয়ে যায়। এবং তার ছ'মাসের মধ্যেই—অতসীর।

মাথায় সিঁদুর নিয়ে ও যখন কাঁদতে কাঁদতে বরের গাড়ীতে গিয়ে উঠছে, তখন একবার আমার কাছে এসে হেঁট হয়ে আমাকে প্রণাম করলো, বললে—সেজদা, আমার জন্যই তোমার সব কিছু কষ্ট, সব কিছু অপমান! আমি বোকা ছিলাম, আমি সংসারের কিচ্ছু জানতাম না। তুমি বিশ্বাস করো, মাধুরীও আমার মতো ছিল। জানি না ওর বিয়ে হয়েছে কিনা, তুমি ওকেও ক্ষমা কোরো, আমাকেও ক্ষমা কোরো। ধরা গলায় শুধু বলেছিলাম—এসব কী বলছিস বোন, তুই সুখী হ। আমি সর্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করি।

আজ যখন নিভৃতে বসে-বসে সেই সব দিনের কথা ভাবি, মনে হয়, এ সব কি মনে রাখবার মতো অসামান্য ঘটনা? প্রতিনিয়ত

প্রতি সংসারেই হয়ত ঘট্ছে। কিন্তু, আজ যখন অতসী পৃথিবীতে নেই, তখন এই সব অতি সাধারণ ঘটনাই অসাধারণ ব্যঞ্জনা নিয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠতে চায়! মনে হয়, সব কিছুর মধ্যে এক আশ্চর্য যোগসূত্র রয়েছে বিদ্যমান।

বিয়ের দেড় বছরের মধ্যেই সব শেষ। অতসীকে আসতে দিতো না বাপের বাড়ী তার শ্বশুর-শাশুড়ী, কী-সব কার্যকারণ, আজ বিশ্লেষণ করে লাভ নেই, কাউকে দোষারোপ করারও প্রয়োজন নেই, কিন্তু হাসপাতালে এক নবীন আগন্তুককে পৃথিবীতে আনবার মুহূর্তে সে যখন পরিচিত বিশ্বসংসার ছেড়ে অজানার উদ্দেশে পাড়ি দিলো, আর সে সংবাদ শুনে তাকে দেখবার জন্য যখন সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম, আগাগোড়া চাদরে ঢাকা সেই নিস্পন্দ দেহটিকেও যখন দেখলাম স্থির হয়ে, তখন প্রথম যে কথাটা মনে হলো সেটা হচ্ছে এই যে, অতসী যে এমনি করে হঠাৎ একদিন চলে যাবে, এ যেন আমার মন আগে থাকতেই জেনে রেখেছিল! মাধুরীও যেমন আসবে না আমার জীবনে আমি জানতাম, তেমনি আমার একমাত্র স্নেহের পাত্রী অতসী যে থাকবে না সংসারে, এ-ও যেন আমার অজ্ঞাতে আমার ভিতরকার মানুষটি জেনে বসেছিল!

শিউরে উঠে সেদিন চলে এসেছিলাম ওর কাছ থেকে। শিউরে উঠেছিলাম নিজের চিন্তাকে অনুধাবন করে। আর সত্যি-কথা বলতে কী আমার সেই প্রবুদ্ধ মনটাকে আমি ভয় করতে আরম্ভ করলাম ঠিক সেই দিনটি থেকেই!

তারপরে সংসার থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি, বদলি হয়ে এসেছি অন্যত্র, আচারে ব্যবহারে স্বভাবে চরিত্রে, আমার বাড়ীর লোকেরা এযাবৎ আমাকে যা ভেবে এসেছে, আমি এতদিন পরে সত্যি-সত্যি তা-ই হয়ে উঠেছিলাম। কোনো নীতি ছিল না জীবনে, ছিল না কোনো আদর্শ, হৈ-হৈ করে জীবনের ঢেউগুলিকে অতিক্রম করে যাওয়াই ছিল আমার একমাত্র লক্ষ্য। রেলের চাকরী যেদিন ছাড়ি,

তার দিনকয়েক আগে আমার মা মারা গেছে, কোনো কারণ নেই, খেয়ালের বশেই চাকরীটা ছাড়লাম। এক তামাক-কোম্পানীর সাহেবের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল যেতে আসতে, তারই আনুকূল্যে আমার পরবর্তী চাকরী। কিন্তু চাকরী-বাকরী, জীবন-ধারণ, সে-সব ত সাধারণ ব্যাপার, যা আমার জীবনে ঘটতে যাচ্ছে, তা এই চল্লিশ বছর পার হবার পর।

উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার থেকে দশ-বারো মাইল দূরে ছোট্ট এক জনপদ, মহাকালগুড়ি। কাঠের ছোট্ট এক দোতলা বাড়ীতে আস্তানা নিয়েছি। সম্বল একখানা দ্বিচক্রযান, এবং এরই সাহায্যে কখনো কালজানি নদী তীরবর্তী শহর আলিপুরদুয়ারে যাচ্ছি, কখনো বা উত্তর-পূর্বে গারোপাড়া পেরিয়ে রায়ডাক নদী ছাড়িয়ে কুমারগ্রাম পর্যন্ত যেতে হয়; মহাকালগুড়ি থেকে মাইল চব্বিশ-পঁচিশ হবে। যেদিন কুমারগ্রাম পর্যন্ত যাই, সেদিন আর ফিরে আসবার মত দৈহিক সামর্থ্য থাকে না। তামাক চাষের জন্য যে-সব রায়তদের কাছে আমাদের দিক থেকে দাদন দেওয়া থাকত তাদেরই একজনের আশ্রয়ে সে রাতটা কাটিয়ে ফিরে আসতাম পরদিন—মহাকালগুড়ি। কখনো ধূ ধূ প্রান্তর, কখনো বা নিস্তব্ধ বনানী, তার মধ্য দিয়ে একমনে এগিয়ে চলেছি আমার বিশ্বস্ত দ্বিচক্রযানটি নিয়ে। এ দৃশ্য পথচারী, কিম্বা বন-থেকে-কাঠ-বয়ে-আনা লরী ড্রাইভারদের প্রায়ই চোখে পড়েছে; এমনি করে করে আলাপ হয়ে গেছে বহু লোকের সঙ্গে। তবে, গারোপাড়া বা কুমারগ্রাম খুব বেশী যেতে হয় না এই রক্ষে। যাতায়াত বেশী ছিল আলিপুরদুয়ারে, আর মহাকালগুড়ির আশে-পাশের গ্রামগুলিতে। তামাক চাষ করানো, তার তদ্বির করা, আর তারপরে সেইসব তামাক পাতা যথাস্থানে চালান করে দেওয়া,—সংক্ষেপে এইই হলো আমার কাজ। দাদনের টাকা দেবার সময়ে, লেখালেখির পর হেডঅফিস থেকে ইন্‌স্‌পেক্টর আসেন, তিনিই ব্যবস্থা করেন দাদন-দেওয়ার, তবে আমার সুপারিশটা সেখানে খানিকটা কার্যকরী হয় বই

কি। এর থেকে এইটুকু বোঝা যাচ্ছে, নগদ টাকা নিয়ে কারবার আমাকে যে খুব করতে হয় এমন নয়, তামাক পাতা কেনবার মরসুমেও ইন্‌স্‌পেক্টর আসবেন। আমার মাইনেটা আসে মনি-অর্ডারে। এবং মাইনে-ঘরভাড়া-রাহাখরচ ছাড়া আর আমার কোনো বাড়তি আয় নেই।

একা মানুষ, ভালোই ত চলে যাবার কথা। ইন্‌স্‌পেক্টর যিনি আসেন তিনি সেই আমার পূর্বপরিচিত সাহেবটি, ইভান্স সাহেব, যিনি আমাকে চাকরী দেবার মূলে। খাস সাহেব নন, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানই হবেন, এবং চলনে বলনে, আপাতদৃষ্টিতে কোনো দম্ভ নেই, অহমিকা নেই, মিশুকে মানুষ। উত্তরবঙ্গেরই কোনো এক স্থানে ছোট একটি বাংলো করে নিয়ে স্থায়ীভাবে বাস করছেন, একটি ছেলে, একটি মেয়ে, দুটিই দার্জিলিং-এ থেকে পড়াশুনা করে, গরম পড়লে মেমসাহেব চলে যান দার্জিলিং। আর সাহেব ঘুরছেন সারা উত্তরবঙ্গ থেকে শুরু করে আসাম পর্যন্ত।

বছর পাঁচ ছয়েকের বড়ো হবে আমার থেকে ইভান্স সাহেব, প্রথম প্রথম যখন আসত আমার আস্তানায়, আমারই বাংলোর একটি ঘরে থাকত, আমার কম্বাইণ্ড-হ্যাণ্ড বাহাদুর যা রান্না করত, তাই খেতো। বলতো—রেলওয়েম্যান, দিন কেমন কাটছে?

রেলওয়েতে প্রথম আলাপ হয়েছিল ওর সঙ্গে, সেইজন্য আমাকে ও কখনো-কখনো পরিহাস করে ডাকত—'রেলওয়েম্যান' বলে। আপত্তি করতাম না। ওর কথার উত্তরে হেসে বলতাম—ওয়াণ্ডারফুল।

বলতো—বিয়ে-থা করোনি, একা একা লাগে না?

বলতাম—বাপ গেছে, মা গেছে, সংসারে যাকে সব থেকে স্নেহ করতাম, সেই বোনও গেছে, বিয়ের কথা আর কে ভাবে বলো? এখন আর ঠিক ইচ্ছে করে না।

ইভান্স সাহেব বিকেলের দিকে টেনে বার করত আমাকে। তখনো আমি মহাকালগুড়িতে আসিনি, তখন আমার আস্তানা পর্যায়ক্রমে

কখনো লাটাগুড়িতে, কখনো তিস্তা-তীরবর্তী বার্ণেস-ঘাটের কাছে জোড়পাকরিতে, কখনো বা কোচবিহার জেলায় শহরের কাছে বলরাম-পুর বা নটবর হাটে। ইভান্স এলে শহর থেকে একটা মোটর ভাড়া করে নিয়ে আসত। সেই গাড়ি করে, নিয়ে আসত আমাকে নিকটবর্তী শহরে। বলতো—হ্যাভ এ স্পোর্ট। এইভাবে জীবন কাটানোর কোন অর্থ হয় ?

শহরে ইভান্সের বন্ধুবান্ধবও যথেষ্ট ছিল, সেই বন্ধুদের সাহায্যে আমরা 'স্পোর্টস'-এ মেতে যেতাম। কিছু অর্থ ব্যয় হতো, একটা মত্ততার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে ভোরের দিকে চলে আসতাম আস্তানায়। নির্জন পথ দিয়ে ফিরে আসছি ইভান্সের ভাড়া-করা গাড়িতে করে, মত্ততার ঘোর তখনো কাটেনি ইভান্সের চোখ থেকে, আমারও কাটবার কথা নয়, তবু যেন নিজের চিন্তাস্রোতের মধ্যে একটা প্রবল নাড়া পেয়ে চমকে উঠতাম! আকাশ ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হয়ে আসছে, বেণুবনের মাথায় শুকতারাটা জ্বলজ্বল করছে। সেই শুকতারাটির দিকে অপলক তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ এক অদ্ভুত চিন্তার ঘোর দুরন্ত নেশার মতো আমাকে পেয়ে বসতো। মনে হতো, অতসী যেন ঐ গ্রহবাসী কোন জীব, হঠাৎই কক্ষভ্রষ্ট হয়ে এসেছিল পৃথিবীর বুকে, কাজ শেষ করে ফিরে গেছে নিজের কক্ষে। ফিরে গেছে বটে, কিন্তু তার এই ছন্নছাড়া পথভ্রষ্ট দাদাটিকে আজও বুঝি ভুলতে পারে নি, তাই সন্ধ্যায় সন্ধ্যাতারা হয়ে, উষাকালে ভোরের তারাটি হয়ে, আমার দিকে অপলক তাকিয়ে আছে স্নেহঝরা দৃষ্টিখানি মেলে দিয়ে? রাগ নেই, তিরস্কার নেই, শুধু স্নেহ আর ক্ষমা!

অন্যান্য দিন কাজকর্ম নিয়ে মেতে থাকি, সকাল-সন্ধ্যায় আকাশের কোণে কখন যে অতসী-তারাটি উঠে আমারই ঘরের বাতায়নের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে, সে আমার দেখবারও অবকাশ হয় না! কিন্তু, ইভান্সের সঙ্গে যতবার প্রমত্ত রজনী যাপন করার পর

শেষরাত্রের দিকে নির্জন পথ ধরে আস্তানার দিকে ফিরে এসেছি, ততবারই, অতসীর দিকে চোখ পড়েছে। ততবারই চোখে পড়েছে, অতসীর সেই স্নেহস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকানোর ভঙ্গিটি? যেন বলতে চায়—কেমন আছো গো তুমি, সেজদা?

আজ, এই মহাকালগুড়ি এসে, প্রথম যেদিন ইভান্সের সঙ্গে আলিপুরদুয়ারে গেলাম ওর ভাড়া-করা গাড়িটি করে, এবং যথারীতি সে রাত্রিটি পানীয় ও যথেচ্ছাচারের মধ্যে কাটিয়ে ফিরে আসছি ভোরের দিকে,—এখানেও দেখি, একটা গর্জন গাছের আড়াল থেকে অতসী তাকিয়ে আছে আমার দিকে। 'মহাকালগুড়ি' 'কালজানি,'-এসব শব্দের মধ্য থেকে 'কাল' কথাটি যেন চেতনার মধ্যে অমনি অকস্মাৎ এক সঙ্গীনধারী প্রহরীর মতো সামনে এসে দাঁড়ালো। কেমন একটা আতঙ্ক যেন আমার সমস্ত সত্ত্বাটাকে পিষে ফেলতে চাইল।

আর, তারপর? কিছুদিন পরে ইভান্স যখন আবার এলো, আবার আমাকে নিয়ে যেতে চাইল শহরে, আমি বিদ্রোহ করি নি বটে, কিন্তু মনটা এক অদ্ভুত বিতৃষ্ণায় ভরে রইল। সে রাত্রিটি পার হয়ে ভোরে যখন ফিরে এলাম এবং বেলা বাড়লে চা-পর্বের শেষে ইভান্স যখন বিদায় নিয়ে চলে গেল, সেদিন নিজেকে নিয়ে একমনে বসে বসে ভাবতে গিয়ে, হঠাৎ মনে পড়ল, বয়স আমার চল্লিশ পেরিয়েছে এই সেদিন, এখন আর কি এসব উচ্ছৃঙ্খলতা সাজে?

সেদিন থেকে মনোজগতে এক অদ্ভুত সুর ধ্বনিত হচ্ছে শুনতে পেলাম। এবং এরই মাসখানেক পরে, আলিপুরদুয়ারের এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে চেয়ে আনলাম একখানা বই। গল্প নয়, কাহিনী নয়, আকাশ-তত্ত্ব নিয়ে লেখা চটি একখানা ছেঁড়াখোঁড়া বই। অনাদৃত হয়ে সেল্‌ফের একাধারে পড়েছিল, হঠাৎ-ই চোখে পড়েছিল আমার। বইখানি নিয়ে পাতা ওল্‌টাচ্ছি, অদূরের টেবিলের ওপর পাতিলেবুর রস মেশানো ড্রাইজিনের গেলাস অপেক্ষা করছে,

পরিচিত ভদ্রলোক অধৈর্য হয়ে পড়ছেন বোঝা যাচ্ছে, বলছেন—আ রে, আসুন, শুরু করা যাক।

টেবিলে ফিরে গিয়ে 'শুরু' করলাম বটে, কিন্তু হাতে বইখানা ছিল। বললাম—বইখানা দিনকয়েকের জন্য দিতে পারেন?

ভদ্রলোক বইয়ের নামটা দেখে নিয়ে তাচ্ছিল্যের স্বরে বলে উঠলেন—নিয়ে যান না, ও আর ফেরত দিতে হবে না। কী খেয়ালে কখন কিনেছিলুম, কে জানে!

এবং সেই চটি বইখানিই নয়, কলকাতায় চিঠি লিখে ভি-পিতে ইংরেজী-বাংলা আরও বহু বইক্রমে ক্রমে আনালামঐ বিষয়ে। পড়াটা যে একটা নেশার ব্যাপার এটা যেন দিন দিন গভীর ভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি! শুধু শুকতারা নয়, পলি হিম্‌নিয়া, জুনো ফ্লোরা, বহু নক্ষত্রের সঙ্গেই আমার পরিচয় ধীরে ধীরে নিবিড় হয়ে উঠছে! আকাশে সব সময় সবাইকে দেখতে পাই না, কিন্তু বইয়ের মধ্যে ত পাই! 'অ্যাণ্ড্রোমিডা' নীহারিকা থেকে শুরু করে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের এই যে ঐশ্বর্য-সম্ভার, এর মধ্যে যে এত বিস্ময় লুকিয়ে আছে, এ সংবাদ পূর্বে কি কখনো জানতাম!

মত্ত হয়ে আছি এ-বিস্ময় নিয়ে, এর মধ্যে আমার দৈনন্দিন জীবনে যে অকস্মাৎ আরেক বিস্ময় এসে উপস্থিত হবে, এ-ও আমার ধারণায় ছিল না। বাহাদুর বহুদিন থেকেই ছুটিতে যাবে ছুটিতে যাবে করছে, কিন্তু ওকে আমি ছুটি দিই কী ভাবে? ও গেলে আমার চলবে কী করে?

রাগ করে বাহাদুর বলত—আমার বুড়া বাপ-মা নেই? তাদের দেখতে ইচ্ছা করে না? বাবা চিঠি লিখেছে, আমার সাদী দেবে।

হেসে বললাম—তাই বল। তা হচ্ছে কোথায় সাদী?

—কোথায় আবার! আমাদের গাঁয়ে!

—কোথায় তোদের গাঁ?

বললে—এখান থেকে আলিপুরদুয়ারে গিয়ে রেলগাড়িতে উঠব।

সেই শিলিগুড়ি যেতে 'শিভক' ষ্টেশন পড়বে না? সেখানে নেমে, পাহাড়ে উঠতে হবে। হাঁটা পথ চার ক্রোশ-পাঁচ ক্রোশ হবে, মংপু-পাহাড়ের নিচে।

বাহাতুর বাংলা বলে চমৎকার, কিন্তু কথায় বার্তায় একটা অদ্ভুত টান আছে, তাতে করে বাংলা বললে 'আধো আধো স্বর' শোনায়। যেন এরটি শিশু কথা বলছে।

বললাম—সাদী করে ফিরতে কতদিন দেরী হবে তোর?

—মাসখানেক।

চমকে উঠলাম—মাসখানেক কি রে! ততদিন আমার কী হবে?

ও চুপ করে আছে লক্ষ্য করে বলতে লাগলাম—তার থেকে সাদী করে বউ নিয়ে এখানে চলে আয়। বেড়ার ধার ঘেঁষে চালা বানিয়ে দিচ্ছি মিস্ত্রি ঘরামি ডেকে, সেই চালাতে তুজনে থাকবি কেমন?

বাহাতুর বললে—হ্যাঁ, তা' থাকতে পারি কিন্তু বউ যদি রাজি না হয়?

—সে কী রে! রাজী হবে না কেন?

বললে—কী জানি! রাজী না হতেও ত পারে! হলে ঠিক চলে আসব।

বললাম—তাহলে? ঠিক বিয়ের জন্য কদিন লাগবে বল?

—সাতদিন লাগবে, তবে মাসখানেকই ধরে রাখুন, যদি না আসতে পারি? খৎ লিখব আপনাকে।

—তা'ত বুঝলাম, কিন্তু আমার এদিকে কী হবে?

—আমি বদ্‌লির লোক দিয়ে যাবো হুজুর।

—ভালো আর বিশ্বাসী লোক ত?

—নিশ্চয়। বাজে লোক আমি দিয়ে যেতে পারি?

এমন একটা সময় ছিল, যখন কেউ না থাকলে নিজের হাতে সব করে নিয়েছি। যে ধরনের ভ্রাম্যমাণ জীবন আমি যাপন করেছি,

তাতে করে গৃহস্থালী দেখবার মতো একজন লোকের আমার সর্বক্ষণ প্রয়োজন হয়েছে, কিন্তু আমার বলার কথাটা এই যে, কখনো যদি হঠাৎ কেউ চলে গেল, ত, চোখে অন্ধকার দেখবার মতো লোক আমি ছিলাম না।

কিন্তু, আজ আমি ভিন্ন ব্যক্তি বলা যায়। সংসারের দৈনন্দিনতা থেকে মনটা আমার কতো সরে গেছে, সেটা তীব্রভাবে অনুভব করলাম আজ, বাহাদুরের এই ছুটিতে যাবার প্রাক্কালে। ও চলে যাবে শুনেই কেমন যেন অসহায় বোধ করতে লাগলাম আমি। এটা আমার মতো পরিবেশে যাদের থাকতে হয়েছে, তারাই হৃদয়ঙ্গম করবেন গভীর করে।

বাহাদুর কিন্তু করিৎকর্মা ব্যক্তি। বোধহয় দিন দুই-ও কাটেনি, বাহাদুর রয়েছে, কাজকর্ম করছে, চলে যাবার কথা আর মুখ ফুটে বলে না, এতে মনে মনে একটা স্বস্তিই বোধ করছি, এমন পরিস্থিতি হঠাৎ একসময় ও এলো বৃদ্ধ একটি ব্যক্তিকে নিয়ে। খালি গা, বিশীর্ণ চেহারা, বুকের হাড়গুলো স্পষ্ট গুণে নেওয়া যায়। মাথার চুলে যথেষ্ট পাক ধরেছে, কেশবিরলতাও সুস্পষ্ট, মুখখানা একটু বেশীই বলিরেখাঙ্কিত, গায়ের রঙ এককালে ফর্সা ছিল, এখন তামাটে হয়ে গেছে, হাতখানি তুলে যখন আমাকে অভিবাদন জানালো, তখন স্পষ্ট লক্ষ্য করলাম, হাত দুটি অস্বাভাবিকভাবে কাঁপছে।

সন্দেহ হলো, এ-লোক কী আমার কাজকর্ম সব করতে পারবে?

জিজ্ঞাসা করলাম—কুঠে বাড়ী?

কণ্ঠস্বর ক্ষীণ, বৃদ্ধ বললে—বাজরা।

—বাজরা।—সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম বাহাদুরের দিকে তাকিয়ে—বাজরা কোথায়?

বাহাদুর নিম্নকণ্ঠে বললে—মানুষটি বাঙালী।

বললাম—বাঙালী ত বটেই, কিন্তু বাজরা কোথায় তা'ত বুঝলাম না।

লোকটি বললে—বাবু কখনো কুমিল্লা গিইছেন ?

—কুমিল্লা ! সে ত এখন পাকিস্তান !

বৃদ্ধের মুখে ঈষৎ বেদনার ছায়াপাত লক্ষ্য করলাম, বৃদ্ধ বললে—পাকিস্তানেই বটে। আপনে কখনো পূর্ব বাঙলায় যান নাই ?

একটু ভেবে নিয়ে বললাম—একবার ভৈরববাজার থেকে মেঘনার পোল পেরিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া গিয়েছিলাম মনে পড়ে। তা' সে অনেক দিনের কথা। তখনো পাকিস্তান হয়নি। অল্প-অল্প মনে পড়ে।

বৃদ্ধ ততক্ষণে কাঠের মেঝের ওপর বসে পড়েছে, কিন্তু উৎসাহে কোটরগত চোখদুটি তার দীপ্তিমান, বললে—ব্রাহ্মণবাড়িয়া হইতে রেলগাড়িতে আখাউড়া আসলেন, কেমন? আখাউড়ায় রেল বদল করেই কুমিল্লা আসলেন। কুমিল্লা হইতে লাকসাম জংসন হইয়ে মাইজদী আর নোয়াখালী যাইতে মাঝের একটা ষ্টেশনে নামতে হয়, তার নাম—বাজরা।

আমার একটা স্বভাব হচ্ছে, যদি কোন কারণে কেউ কোনো পথের বর্ণনা দেয়, বিশেষ করে রেলের বর্ণনা, তাহলে, খুবই উৎসাহিত হয়ে উঠি, ভূতপূর্ব রেলের লোক বলেই বোধ হয় এ-স্বভাবটা আমার মজ্জাগত হয়ে গেছে।

তাই, এ-লোকটি যে পূর্ব বাঙলা থেকে বিতাড়িত অগণিত ছিন্নমূল নরনারীদের একজন, এ-কথা বুঝেও প্রশ্ন করে বসলাম—বাজরার লোক এখানে এলে কেমন করে ?

দুটি ছলছল চোখ তুলে লোকটি তাকালো আমার দিকে, বললে—সে অনেক দুঃখের কথা বাবু, শুনে আর কী করবেন। জ্বালাইয়া পুড়াইয়া দিলো যেইদিন, সেইদিন মনের সুখ এই যে, আমার ইস্ত্রী তার আগের বৎসর মারা গিইছিল কলেরা হয়ে, তাকে আর চোখ মেইলা ঐ সব দুদ্দশা দেখতে হয় নাই।

বলতে বলতে গলাটা তার ধরে এলো। বললাম—থাক, তোমার বলতে কষ্ট হয় ত দরকার নেই। কী জাত তোমরা ?

—যুগী।

বললাম—তা'হোক, আমার অতো জাত মানা স্বভাব নেই, যদিও বামুনের ঘরের ছেলে। তা' বুঝে নাও কাজকর্ম, রান্নাবান্না-হাটবাজার সব করতে হবে।

লোকটি বললে—সবই করব! কিন্তু বাবুর কাছে আমার আর্জি আছে।

—কী?

লোকটি উঠে দাঁড়ালো, বললে—হাটবাজার, বাইরের সবই কাজ করতে পারব কিন্তু চোখে ঝাপসা দেখি, ঐ রান্নাটা আমি করতে পারব না, আমার বদলে আমার মাইয়ে এসে করে দিয়ে যাবে। না বাবু, তার জন্য বাড়তি আপনাকে দিতে কিছু হবে না।

বললাম—কিন্তু, এত-কিছুর দরকারও ছিল না, বাহাদুর যাচ্ছে, বড়ো জোর মাসখানেকের মধ্যে ফিরে আসবে। তোমার চাকরী ঐ বড়ো জোর মাসখানেকের জন্যে।

লোকটি হাত জোড় করে বললে—তা হোক। কোনরকমে একটু স্থিতু হতে দিন বাবু, পনেরোটা বৎসর ধরে এই যে তাড়া খেয়ে জন্তু-জানোয়ারের ল্যাখন ঘুরিয়া বেড়ানো, এর থিক্যা কয়েকটা দিন ত বাঁচি।

—তোমার নাম কী?

বললে—যোগীন্দ্রচন্দ্র নাথ।

বললাম—কিন্তু, যোগীন্দর, লোক দরকার আমার একজন। এক-জনকে খাওয়াপড়া দেবো, এই কথা। দু'জন রাখলে আমার চলবে কেন? কতই বা আয় করি?

লোকটি জিভ্ কাট্‌ল লজ্জায়, বললে—ঐ একজনকে যা দিবেন, তার বেশী এক কড়িও দিতে হইবে না। খাওয়াপড়া পনেরো টাকা ত দিবেন, এই বাহাদুর কইল? তাতেই হইব। মাইয়াডা রান্না করব, ওরেই দুডা খাইতে দিবেন, আমার লাগব না।

লোকটির কথাবার্তায় অদ্ভুত এক ভাষার টান লক্ষ্য করছি। কখনো কুমিল্লা-নোয়াখালির টান, কখনো পশ্চিম বাঙালার টান, আর ভাষা-ভঙ্গীতে এসেছে অদ্ভুত এক মিশ্রণ। পুব-পশ্চিম উভয় বাঙলার কথ্য-ভাষা মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

বললাম—তুমি বোসো দেখি স্থির হয়ে? একটু চা খাও বসে বসে। কথাগুলি সব শুনি।

বলে, বাহাদুরকে বললাম 'চা' করে আনতে।

বাহাদুর চলে গেলে বললাম,—এখানে কোথায় উঠেছ?

যোগীন্দ্র বললে—উইঠব আর কোথায়? আপনার বাসার সামনের পথ দিয়ে পুবে খানিকটা দূর গেলে ঐ যে জঙ্গলটা পড়ে, ঐ জঙ্গলের সামনেটা অল্প সাফ করে নিয়ে লোকের কাছ থে' চেয়ে-চিন্তে বাঁশ-টাঁশ নিয়ে দরমা করে, কোনরকমে একখানা এই এতটুকু চালা উঠাইছি। তা-ও ডরে কাঁপি, জঙ্গলের বাঘই না আসিয়া পড়ে, আর অন্য দিকে যার জমি, সে না আসিয়া বলে—জবর দখল কর্‌ছ, চলিয়া যাও।

জিজ্ঞাসা করলাম—তোমরা কয়জন?

বললে—তিনজন। আমি আর দুই মাইয়া।

ক্রমশই কৌতুহলী হয়ে উঠছি। বললাম—তা' দুই মেয়ে নিয়ে এই জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়লে কেন? শহর-টহরে মাথা গুঁজবার ঠাঁই পেলে না?

বৃদ্ধের চোখ দুটি আবার ছলছল করে এলো, বললে—আমার মতো কতো মানুষ হা অন্ন করিয়া ঘুরতেছে বাবু, কয়জন আর শহরে আশ্রয় পায়?

বলে উঠলাম—মেয়েরা কত বড়ো? বিয়ে দিয়েছ?

চোখ দুটি যেন মুহূর্তে জ্বলে উঠল, তারপরে দেখলাম, সেই বিস্ফারিত চোখ দুটি ফেটে যেন জল এলো, ঠোঁট দুটি থর্‌ থর্‌ করে কেঁপে উঠল। আমি অপ্রস্তুত বোধ করে তাড়াতাড়ি চেয়ারটা ঠেলে

উঠে দাঁড়ালাম, তারপর লোকটির কাছে গিয়ে একটা হাত ধরলাম ওর। ঠাণ্ডা বরফের মতো হাত, হাড়ের ওপর চামড়া বসানো। বললাম—তোমার কষ্ট হচ্ছে। থাক, এখন কিছু বলতে হবে না।

লোকটি ক্রন্দন বিকৃত কণ্ঠে বলতে লাগল—বাবু, বলতেও ত প্রাণ চায়! আমাদের ওপর কারুর দরদ দেখলে আমাদের প্রাণটাও বলা, কওয়া করে হাল্কা হতে চায়!

ধীরে ধীরে বসলাম এসে চেয়ারে। যোগীন্দ্র কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছে নিয়ে বললে—আমার দুই মেয়ের নাম তাদের মা সাধ করিয়া রেখে গিয়েছিল—সরস্বতী আর লক্ষ্মী। ওদের দুটিকে বুকে নিয়া যখন 'বাজরা' ছাড়িয়া আসি, তখন সরস্বতী ডাগর মেয়ে, পনেরোয় পা দিছে। লক্ষ্মী তখন ছোট্টটি, পাঁচ বৎসরের মাইয়াড়ি। অগো মাঝে আর দুটি সন্তান ছিল, একটি মাইয়া, একটি ছেইলা, তা' সে দুটি আঁতুড়েই মারা গিয়েছিল।

একটুক্ষণ থেমে থেকে আবার বলতে শুরু করল যোগীন্দ্র,—পনেরো বৎসর কাটি গেছে, তাই না বাবু? তা হলেই সরস্বতী আজ এক কুড়ি দশ, হইল গিয়া তিরিশ, তিরিশে পা দিছে। আর, লক্ষ্মীর হইল এক কুড়ি। বাবু আপনারে বলব কী, আমার বড়ো মাইয়াডা, ঐ সরস্বতী, ও পাগল হইয়া গেছে, বদ্ধ পাগল। ওকে সামাল দিয়ে রাখতে হয়।

চমকে উঠে বললাম—কেন?

যোগীন্দ্র কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে চুপ করে বসে রইল, তারপর বললো—সে অনেক কথা।

ইতিমধ্যে বাহাদুর নিয়ে এলো চা। আমার দিকে একটা কাপ এগিয়ে দিয়ে নিজেরা দু'জনে দুটি কাঁচের গেলাস নিয়ে বসল।

বললাম—যোগীন্দ্রকে শুধু চা দিলি?

অল্প একটু হেসে যোগীন্দ্র বললে—ঠিক আছে বাবু। আমি বুড়া মানুষ, দাঁতটাত কিছু নাই, ওই চা-ই আমার যথেষ্ট।

—বয়স কতো হলো ?

—কার ? আমার ?

—হ্যাঁ ?

বৃদ্ধ বললে—তা তিন কুড়ি পেরিয়ে গেছে।

চা-পর্ব শেষ হবার পর জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা যোগীন্দ্র, এই মহাকালগুড়িতে এসে পড়লে কেমন করে।

মুখ তুলল যোগীন্দ্র, বললে—বাবু, ঐ যে বললাম সে অনেক কথা। এই পনেরো বৎসরে কোথায় না ঘুরেছি! বাজরা থেকে কোন রকমে এসে পড়লাম আখাউড়া। সেখানে কটা দিন থাক্যাই, কিভাবে যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া আশুগঞ্জ ভৈরববাজার হইয়া কিশোরগঞ্জ পর্যন্ত আস্‌লাম, সেকথা আপনাকে আরেকদিন বলব। কিশোরগঞ্জে থিক্যা আসলাম পায়ে হাইট্টা হুসেনপুর। সেইখানে ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া আসলাম গফুর গাঁও। গফুর গাঁও থিক্যা রেলগাড়ি কইরা আসলাম ময়মনসিংহ শহরে। তখন পুব-বাংলায় কী কাণ্ড হইতেছে সে ত জানেনই আপনে, খবরের কাগজ নিশ্চই পড়ছেন।

বললাম—বুঝতে পারছি। যদিও আজকাল খবরের কাগজ পড়ি না। তারপর? বলে যাও।

সে বললে—দুটি মাইয়া কীভাবে যে চোরের মতন রাস্তা আর রেল চড়ছি, তা আপনাকে কী বলব? ময়মনসিংহতেও কী থাইক্‌বার জো ছিল? কোন রকমে রেলে চইড়া আইলাম জামালপুর, জামালপুর থাইক্যা আসলাম লাহাদুরাবাদ ঘাট। ষ্টীমারে এপারে আসলাম—ফুলছড়ি। ফুলছড়ি থাইকা বোনারপাড়া হইয়া আসলাম গাইবান্ধা।

বললাম—তোমার সব নামগুলি মনে আছে হে?

চোখ দুটি আবার জলে ভ'রে এলো, বললে—মনে থাকবে না বাবু? এক-একটা যায়গায় এসেছি, আর দুইটি প্রাণীতে চক্ষের জলে মাটি ভিজাইছি। লক্ষ্মী ছোট ছিল, ও কিছু বুঝত না, ফ্যালফ্যালাইয়া

বাপ আর দিদির মুখের দিকে তাকাইয়া থাকত। তারপরে শোনেন। গাইবান্ধা থিক্যা কাউনিয়ায় তিস্তা পার হইয়া আসলাম লালমণির হাটে আমার জানাশুনা মাইজদীর একটি মাইন্‌সের সাথে দেখা! দুটি পোলা হারাইয়া বুড়া-বুড়ী চল্‌তেছে আসাম, ভাইগনার কাছে। বললে—তুমিও চলো হে যোগীন্দ্রর, তারপরে যা হয়, হইব। ভগবানের নাম লইয়া গেলাম বাবু তাগো সাথে।

এই যে পথের কথা এতগুলি কইলাম বাবু, এ কিন্তু একদিনে দুই দিনে আসি নাই। বিশ্বাস করবেন? বজরা থিক্যা লালমণির হাট আসতে আমাগো ছয়-ছয়ডা মাস লাগছিল। এইখানে চারদিন থাকি, ঐখানে দশদিন। এমন কইরাই ত আসা-যাওয়া। ট্যাকার কথা শুধাইবেন ত? ট্যাকা পাইছিলাম। কী কইরা পাইছিলাম, কে আমাগো দিছিল, বাজরা থিক্যা লাললণির হাট-তক তিনজনের প্রাণডা কে বাঁচাইয়া দিছিল, সে-ও আপনার কাছে পিছে বলাকওয়া করব। এইটুকু শুধু আজ শুইন্যা রাখেন, লালমণির হাটে যখন আইস্যা পৌছলাম, তখন আমার বড়ো মাইয়াডা গব্ববতী।

—সে কী! বিয়ে দিয়েছিলে?

বৃদ্ধর ঠোঁট দুটি আবার থর্‌থর্ করে কেঁপে উঠল, বললে—না বাবু। বিয়া আর হইল কই? সে আপনাকে পিছে কমু অনে। তয়, শোনেন? লালমণির হাট থনে আইলাম গিতালদহ। আপনাগো হিন্দুস্থান। তখন মাঝে সাঝে গিতালদহে গোলকগঞ্জ রেলগাড়ি যাতায়াত করে। অপিসার কী-সব পাশপুশ হাতে ধরাইয়া দিলো, আমরা ত আসাম যাইবো, তাই গোলকগঞ্জ পর্যন্ত যাইতে দিলো। হিন্দুস্থানে থিক্যা হিন্দুস্থানেই যাইবো, আবার মাঝে একটুখানি পাকিস্তান হইয়া। বাবু, আমার একখান খাতা ছিল, যেখানে যেখানে গেইছি, সব নাম লিখা রাখতাম। লক্ষ্মী-সরস্বতীর মায়েরে ত বাজরায় শোয়াইয়া রাইখ্যা আইছি, তাই সময় পাইলেই বইস্যা বইস্যা খাতার ঐ নামগুলান পড়তাম, আর যেইখানেই থাকি না ক্যান, মনে মনে

রোজ একবার কইরা বাজরায় চলিয়া যাইতাম। পনেরোটা বৎসর ত বইস্যা বইস্যা এ-ই করছি! আর করছি কী?

জিজ্ঞাসা করলাম—আসামে কোথায় ছিলে?

বৃদ্ধ উত্তর করল—ঐ যে আমাগো জানাশোনা মানুষটি, রজনী মালাকার, সে ছিল সোরভোগে। সেই সোরভোগেই আমরা সকলে মিলা উঠলাম। ভাইগ্‌না সন্তোষের ছিল চাইল-ডাইলের আড়ত। বুড়া মামা-মামীরে সে ফেলে নাই, অমোগোও সে একটা ব্যবস্থা কইরা দিলো। তার কিছু জমিন্ ছিল শহরের কিনারে, সেইখানে চালা বানাইয়া লইলাম! বাবু, প্রায় পনেরোটা বৎসর সেইখানেই সুখে-দুঃখে কাটছে। সরস্বতীর ছেইলা হইল সেইখানে, চৌদ্দ বৎসরের ছেইলাটির মুখের পানে তাকাইয়া সরস্বতী সবই ভুলছিল।

রুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করলাম—কোথায় সে ছেলে?

বৃদ্ধের চোখ দিয়ে আবার ধারা নেমেছে, বললে—বাবু, ক্ষেতে কত কী ফসল বুনছিলাম! ভাইগনারে পাঠাইয়া দিয়া যা থাকত, আমাগো হাইস্যা খেইল্যা চইলা যাইত। এছাড়া, আমি বাঁশ কাইট্টা, চুবড়ি বুনতে পারি, দরমা বানাইতে পারি, ভগবানের দয়ায় দিন চইলা যাইতেছিল একরকম। ছেইলার নাম রখেছিল সখ কইরা'—কানাই। ডাকত—'কানু কানু' কইরা। 'কানু' ছিলো আমাগো তিনজনের চোখের মণি। সেই কানু আর নাই।

—কী হলো তার?

বৃদ্ধ কাপড়ের খোঁটে চোখ মুছল, বলল কানু দুই ক্রোশ পথ হাইট্টা বড়ো স্কুলে যাইত। আর একখান বৎসর কাটলে কানু একটা পাশ দিয়া বার হইত। তখন আমাগো আর দুঃখু থাকত কী?

—কী হয়েছিল তার?

বৃদ্ধ ধরা গলায় বললে—সেও আপনারে পিছে কমুনে। কত আর শুনবেন! বাস্তুহারা হইয়া আসাম আসলাম, সেইখান থিক্যাও গরু ছাগলের মত তাড়াইয়া দিলো।

খবরের কাগজ না পড়লেও এ খবরটা রেখেছি। আলিপুরদুয়ারে গিয়ে স্বচক্ষে দেখেও এসেছি সে সব শোচনীয় ব্যাপার। গোয়ালপাড়া জেলার নানান জায়গা থেকে কিছু কিছু লোক সংকোনো নদী পার হয়ে জোরাই, কামাখ্যাগুড়ি ত এসেছেই, কুমারগ্রাম পর্যন্ত লোক এসেছে।

বললাম—ও, তোমরা তাহলে আসাম থেকে এসেছ?

—হ্যাঁ, বাবু।

মনটা এমন ভারাক্রান্ত হয়ে গেল যে, আর কোনো কথা বলতে পারলাম না। আমি ভূতপূর্ব রেলের লোক, আমার পরিচিত কিছু কিছু নর্থ ইষ্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়েতেও এসেছিল। গোরেশ্বর বা রঙ্গিয়ায় সে সব মানুষের কী নিদারুণ লাঞ্ছনা হয়েছিল, সেও আলিপুরদুয়ার স্টেশনে বসে খবর পেয়ে এসেছি। কিন্তু, সে সব কথা এখন থাক।

বাহাদুর পরদিনই চলে গেল। এবং সে চলে যাবার কিছুক্ষণ পরেই এলো যোগীন্দ্র তার মেয়েকে নিয়ে। উনিশ-কুড়িই হবে মেয়েটির বয়েস, একটু লম্বা লম্বা গড়ন, অপুষ্ট চেহারা। বাপের সঙ্গে এসে আমার সামনে যখন দাঁড়ালো, তখন তার গিঁট দেওয়া কাপড়ের দিকে তাকিয়ে আমারই যেন মাথা নীচু হয়ে গেল। যোগীন্দ্রকে বললাম—ওঁকে রান্নাঘরে নিয়ে যাও যোগীন্দ্র, কাজকর্ম বুঝিয়ে দাও। তোমারি কিন্তু সব দায়িত্ব, আমাকে যেন কোনো ঝক্কি না পোয়াতে হয়!

যোগীন্দ্র কোনো কথা না বলে মেয়েকে নিয়ে চলে গেল। আমার সেদিন সাইকেল নিয়ে একটু বেরুবার দরকার ছিল, কিন্তু যোগীন্দ্রের কাহিনী মনটাকে এমন আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে কাজ কর্ম করতে আজ আর ইচ্ছে করছে না।

কিছুক্ষণ নীরবে পার হয়ে গেল। ইভান্স একটা জরুরী চিঠি লিখেছিল, সেই চিঠির উত্তর দিতে হবে বলে চিঠিখানা আবার ভালো করে পড়ছি কিন্তু তাতেও মন লাগলো না। চীৎকার করে ডাকলাম—যোগীন্দ্র?

—যাই বাবু।

সাড়া দিয়ে কছে এসে দাঁড়ালো। বললাম—বুঝিয়ে দিয়েছ ?

—হ্যাঁ বাবু। উনুন ধরিয়ে দিচ্ছে।—বলে, একটু দম নিয়ে যোগীন্দ্র বলেল—কিন্তু চা-বানাইবার যন্ত্রটা কি করব বাবু, ওটা আমাকে দেখাইয়ে দিয়া গেছে বাহাত্বর, কিন্তু আমি ভুইলা গেছি।

ব্যাটারী সেট-এর একটা 'হিটার' ছিল, বুঝলাম সেই 'হিটার'টার কথা বলছে যোগীন্দ্র। বললাম—চা সকালে বাহাত্বর আমাকে খাইয়ে গেছে। চা পরে হবেখন, এখন চলো দেখি আমার সঙ্গে বাজারে।

—চলেন।

—থলেটা নাও।

নিয়ে এলো। বললাম—আজই বাজার করছি। বাজারে কিন্তু যেতে হবে তোমাকে, বুছলে।

মাথা নেড়ে সে জানালো যে সে বুঝেছে।

বললাম মেয়েকে বলে এসো, ঘরদোর খোলা রইল একটু যেন দেখে।

গেল সে রান্নাঘরে। পরমুহূর্তে ফিরে এলো। আমি জামাটা পরে ততক্ষণে মণিব্যাগটা পকেটে পুরে নিয়েছি। বললাম—চলো, ত্বজন যখন, তখন আর সাইকেল নয়, হেঁটেই যাই।

মিনিট পনেরো হাঁটতে হয়। 'বাজার' কথাটা ব্যবহার করলাম বটে, আসলে এখানে 'হাট'ই সব। সপ্তাহে ত্ব'দিন বসে হাট। আজকাল অবশ্য ত্ব'চারটে দোকান হয়েছে, একটা দোকানে তরী-তরকারীও কিছু রাখে। আজ হাটবার নয় বলে, সেই দোকানটিই ছিল আমাদের লক্ষ্য।

দোকানের কাজ সারতে বেশীক্ষণ লাগল না। ওকে বললাম—তুমি এখানে একটু দাঁড়াও, আমি আসছি।

বলে, কাছেই ছিল এ অঞ্চলে 'একম্-এব-অদ্বিতীয়ম্' বস্ত্রালয়টি, যোগীন্দ্রের মতোই ছিন্নমূল হয়ে এসে এক ব্যক্তি কাপড় নিয়ে ঘুরে

ঘুরে ফেরি করতে করতে অবশেষে এই দোকানটি খুলবার মতো সামর্থ্য অর্জন করেছে। তার কাছ থেকে একটি পছন্দসই রঙীন তাঁতের শাড়ী, বেশী দামের নয় অবশ্য, আর সায়া, আর ব্লাউজ ইত্যাদির জন্য কাপড় কিনে নিলাম। এসে বললাম—চলো যোগীন্দ্র, এসব তোমার মেয়ের জন্য।

মাথাটা নীচু করে রইল যোগীন্দ্র, কিছু বলল না, তারপরে সেইভাবেই নির্বাক হয়ে চলতে লাগল আমার পাশাপাশি। এত রুগ্ন যে একটু দ্রুত ভঙ্গীতেও চলতে পারে না, ধীরে ধীরে হাঁটতে হয়। সুতরাং বাড়ি থেকে বেরুনো আর বাড়ি ফিরে আসা, এর মধ্যে যথেষ্ট সময় চলে গেল। এবং এই যে অযথা সময় চলে যাওয়া, এটা অনুভব করে মনে মনে একটু রুষ্টই হয়ে উঠলাম; মনে হলো বাহাদুর আমাকে আচ্ছা ফ্যাঁসাদেই ফেলে গেল দেখছি।

আমার মনের ভাব বাইরে প্রকাশ করলাম না বটে, কিন্তু ফিরে এসে স্নানাদি করে তৈরী হতে লাগলাম বেরিয়ে পড়বার জন্য। মেয়েটি পাশের ঘরে আমায় খেতে দিল। এইটুকু সময়ের মধ্যে বেশী রান্না হওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু আমার মনটা তখন এত অসহিষ্ণু হয়ে গেছে যে, ভাতের পাতে মাত্র কিছু ভাজাভুজি, আর থালার পাশে ডালের বাটি দেখে মনটা মুহূর্তে যেন বিতৃষ্ণায় ভরে গেল। একবার ইচ্ছা হলো, থালা আর বাটি ছুঁড়ে ফেলে দেই।

যোগীন্দ্র কাছেই দাঁড়িয়ে আছে অপরাধীর মতো, বললে দুধ আছে বাবু। গরম করছে।

অতিকষ্টে ভিতরের উষ্মা রোধ করে চুপচাপ খেয়ে উঠলাম। কিন্তু, সব মিলিয়ে আমি যে খুশী হইনি, এটা বুঝতে ওদের দেরী হবে কেন? ওদের সন্তর্পণ চলাফেরা দেখেই তা বোঝা যাচ্ছে।

পোশাক আশাক পরিধান করে ঘর দুটিতে চাবি দিয়ে পকেটে রাখলাম। যোগীন্দ্রকে বললাম তোমাদের কাজ হয়ে গেলে রান্নাঘরে তালা দিয়ে রেখো। এই নাও তালা আর চাবি। বাড়ি খোলা রেখো

না। তুমি বারান্দায় মাতুর পেতে একটু গড়িয়ে নেবে। আমার ফিরতে বিকেল হয়ে যাবে।

কিন্তু তা হলো না। আমি যখন ফিরে এলাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। দেখি, রান্নাঘরে আলো জ্বলছে, আর বারান্দার সিঁড়ির কাছে যোগীন্দ্র বসে আছে ছায়ামূর্তিটির মতো।

বড়ো শ্রান্ত ছিলাম, চাবি ওর হাতে দিয়ে ঘর খুলতে বললাম। ওর ডাকাডাকিতে রান্নাঘর থেকে ওর মেয়ে এলো হ্যারিকেন হাতে। সেই আলোয় ঘর খুলল যোগীন্দ্র। সে রাত্রে খাওয়া দাওয়ার সময়ে ঘুমে আমার যেন হু'চোখ ঢুলে আসছে! কী দিয়ে খেলাম, কতটুকু খেলাম, সে সব খেয়াল করবার মতো দেহমন আদৌ সজাগ ছিল না।

দেহমন সজাগ হলো পরদিন সকালে। যোগীন্দ্র এসে যখন আমার চেয়ারের পাশে টিপয়টি টেনে এনে রাখল, আর ওর মেয়ে নিয়ে এলো চা আর খানকতক লুচি আর হালুয়া, তখন মনটা সত্যিই খুশী হয়ে উঠল বই কী!

জলখাবারের সদ্ব্যবহার করছি, মেয়ে একপাশে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যোগীন্দ্র বললে—লক্ষী জিজ্ঞাসা করছে, এ বেলা কী রান্না হইবে, বাবু?

বললাম—ওসব ভাবতে আমি পারব না। এই টাকা নাও, বুঝে-সুজে বাজার নিয়ে এসো। যা ইচ্ছে, করো। টাকা নিয়ে যোগীন্দ্র চলে যাচ্ছিল, বলা বাহুল্য, ওর মেয়ে তার আগেই রান্নাঘরে প্রস্থান করেছে, আমি পিছন থেকে ডেকে বললাম—যোগীন্দ্র?

—আজ্ঞে?

—শোনো।

কাছে এলো। বললাম কাল ত শাড়ী এনে দিয়েছি, তোমার মেয়ে সেই পুরোনো কাপড়টাই পরে আছে কেন? মাথা হেঁট করে রইল যোগীন্দ্র, কোনো উত্তর দিলো না।

বললাম—বাপ হয়ে মেয়ের দিকে তাকাও কী করে?

যোগীন্দ্র তবু নিরুত্তর।

বললাম—ব্লাউজ না হয় এখনো তৈরী হয় নি, কিন্তু সায়া-শাড়ী ত পরতে পারত?

মুখ তুলল যোগীন্দ্র, দেখি চোখ ছুটি ভরে গেছে জলে। অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে বলে উঠল সে—বাবু, অপরাধ নেবেন না, ওর সায়া-শাড়ী সব ওর বড় বোন কেড়ে নিয়েছে।

একটু অবাক হয়েই প্রশ্ন করলাম—মানে।

যোগীন্দ্র বললে—তার মাথার ঠিক নেই আপনাকে ত বলেছি বাবু।

বললাম—তা'বলে—না—না—এটা তোমরা হতে দিলে কী করে? জোর করে কেড়ে নিতে পারলে না?

—কার কাছ থেকে কাড়ব বাবু!—যোগীন্দ্র বলে উঠল—তার কী কিছু আছে? ছেঁড়া কানি পরে ঘুরিয়া বেড়ায়।

মুহূর্তে যেন একটা নাড়া পেয়ে স্থির হয়ে গেলাম। এ-সব দুর্দশার কথা বাঙলাদেশের লোক হয়ে তেরোশো পঞ্চাশের মন্বন্তর থেকে শুনে আসছি, দূর থেকে নিজের চোখে দেখেছিও কিছু কিছু। কিন্তু, এবার মনে হলো, এ যে আমার নিজের সংসারের ঘটনা!

টেবিলের ড্রয়ার খুলে দশটা টাকা বের করে ওর দিকে ছুঁড়ে দিলাম, বললাম—এই নাও। কালকের সেই দোকানটায় চলে যাবে সোজা, শাড়ী আর সায়া নিয়ে আসবে, যত তাড়াতাড়ি পারো।

নোটটা কুড়িয়ে নিয়ে যোগীন্দ্র চলে যাচ্ছিল নতমুখে, ডেকে বললাম—দানখয়রাত এ'নয়, দশ টাকা আর খাওয়া পরায় থাকতে রাজী হয়েছিলে। তোমার বদলে তোমার মেয়ে রাঁধছে বলে তাকে দিয়েছিলাম। কিন্তু, এ টাকা তোমাদের মাইনে বাবদ আগাম দিয়ে দিলাম। মনে থাকে যেন।

মাথা হেলিয়ে কোনরকমে সম্মতি জানিয়ে আমার চোখের সামনে থেকে সরে গেল যোগীন্দ্র। আমি চায়ের কাপটা টেনে নিলাম।

কিছুক্ষণ পরে, মাথা যখন একটু ঠাণ্ডা হয়েছে, তখন মনে হলো, যোগীন্দ্রর মেয়েটাকে ডেকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করব নাকি? কিন্তু, জামাবিহীন শরীরে ছেঁড়া শাড়ীর আঁচল টেনে ঐ ওর জড়োসড়ো ভঙ্গী, ওর কথা মনে হতেই কেমন যেন সংকোচ হলো।

তাই, জোর করে মন থেকে ও-সব প্রসঙ্গ সরিয়ে রেখে, অফিসের কাগজ পত্র টেনে নিলাম টেবিলের ওপর। কাল বাইরে বেরিয়ে অনেক কাজ সেরে এসেছি, আজ নিজেকে ছুটি দিলেও ক্ষতি নেই, তবু কাজের মধ্যে নিজেকে মুহূর্তে ডুবিয়ে দিতে চাইলাম।

একটুক্ষণ পরেই দরজায় পড়ল একটি ছায়া এবং পরমুহূর্তে পায়ে পায়ে লক্ষ্মী এসে দাঁড়ালো ঘরের মধ্যে। এগিয়ে এসে জলখাবারের উচ্ছিষ্ট পাত্র আর শূন্য চায়ের পেয়ালা টেনে নিলো হাতের মধ্যে। নিয়ে, যথারীতি চলে যাচ্ছিল, ডেকে বললাম—শোনো।

মেয়েটি দাঁড়িয়ে পড়ল। বললাম—তোমার বাবাকে চা দিয়েছিলে?

চুপ করে একভাবে দাঁড়িয়ে রইল। প্রায় ধমকের স্বরেই বলে উঠলাম—কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন?

এইবার কথা বললে মেয়েটি মৃদুকণ্ঠে—আস্‌লে খাবেনে।

এবং বলেই আর দাঁড়াল না, দ্রুতপায়ে ঘর থেকে গেল বেরিয়ে।

হাতের কাজটা ঠেলে ফেলে রেখে উঠে দাঁড়ালাম। পাশের ঘরে ঝাঁট পড়েছে, সেটা লক্ষ্য করেছি, কিন্তু এ ঘরে এখনো ঝাটপাটও পড়েনি, বিছানাটাও আগোছালো হয়ে পড়ে আছে। দ্বিতীয়তঃ, বাহাদুর তোলা উনুনটা ধরিয়ে আনত নীচে থেকে, এ মেয়ে ও ঘরেই উনুন ধরাচ্ছে নাকি? কাঠের বাড়ি, উনুনের ব্যাপারে খুব সাবধানে থাকা উচিত। তারপরে, চা করছেই বা কিসে? 'হিটার' জ্বালাতে শিখেছে কী?

এ সব সাতপাঁচ ভেবেই আমি পায়চারী করতে করতে এক সময় ঘর থেকে বারান্দায় এলাম, মাঝের ঘরটা বেশ বড়ো, এটাতেই ইভান্স এসে থাকে, একপাশে খাট-বিছানা, অন্য দিকে বেতের চেয়ারের সেট

সাজানো, অতিথি অভ্যাগত এলে যাতে বসতে পারেন। এই ঘরটার পাশে আর একটা ঘর, সেটা 'ষ্টোর রুম' হিসাবেও ব্যবহার হয় এবং একপাশে খাওয়ার টেবিল পাতা, তার দু'ধারে হাতলবিহীন গোটাচারেক চেয়ার সাজানো। এটার পাশের ঘরটাই বাহাদুর রান্নাদির হিসাবে ব্যবহার করত। নীচে যে একটি ঘর রয়েছে, সেটিই রান্নাঘর হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাতে স্তূপাকার করা নানান জিনিষ পত্র, এক পাশে থাকে সাইকেলটা।

ধীর পায়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলাম। উনুনে ভাত চাপিয়ে দিয়ে মেয়েটি পিঁড়িতে বসে কী যেন ভাবছিল, আমাকে দেখে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালো। লক্ষ্য করে দেখলাম, উনুনটা দেয়াল ঘেঁষে রাখেনি, অনেকটা সরিয়ে ভিতরে এনে রেখেছে। বাহাদুর উনুন রাখবার জায়গা করেছিল কাঠের পাটাতনের ওপরে অনেকটা অঞ্চল জুড়ে ইট পেতে। তারই ওপর বসিয়েছে মেয়েটি—উনুন।

বললাম—সাবধানে রান্না করছ কিনা তাই দেখতে এলাম। উনুন কি এখানে ধরাও নাকি ?

মাথা নেড়ে জানালো—না।

—তবে ?

বললে—নীচে থিক্যা ধরাই আনি।

—কে এনে দেয়, যোগীন্দ্র ?

বললে—না। বাপ পারবে না।

—তবে কি তুমিই আনো ?

মাথা হেলিয়ে জানালো—হ্যাঁ।

সবিস্ময়ে তাকালাম। ঐ তো রোগা লিকলিকে খেতে-না-পাওয়া চেহারা, নীচে থেকে জ্বলন্ত উনুন ও টেনে নিয়ে আসে কী করে!

বললাম—চা বানালে কী করে ? হিটারে ?

বলে একপাশে সরিয়ে রাখা যন্ত্রটার দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখালাম। মেয়েটি উত্তর দিলে—না।

বললাম—সেই ভালো। না জেনে ও সব নিয়ে টানাটানি করা ভালো নয়।

চুপ করে রইল। বললাম—মাঝের ঘর দুটি ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করেছ। আমার ঘরটিতে হাত দাওনি কেন ?

মৃদুকণ্ঠে বললে—আপনি মাঝের ঘরে একটু বসবেন ?

—কেন ?

—ঝাঁট দিয়া দিচ্ছি।

বললাম—কিন্তু, সকালেই ওটা করা উচিত ছিল না কি ?

মেয়েটি মুখখানা আরও নীচু করল, বোধহয় লজ্জাই পেলো কথাটায়। বললে—বাপে বললে—আপনে রাগ করবেন।

—কেন ?

মেয়েটি তেমনি মুখ নীচু করেই বলতে লাগল—বাপে নিজে ঝাঁট দিবে বলছে।

বললাম—সে কী পারবে ? তার হাত ত দেখি কাঁপে ?

মেয়েটি চুপ করে রইল। দেখবার ভুল হতে পারে, কিন্তু মনে হলো চোখে জল এসে পড়েছে, এইবার বাঁধ ভেঙে গালে-ঠোঁটে-চিবুকে গড়িয়ে পড়বে ?

তাড়াতাড়ি সরেই আসছিলাম, চৌকাঠ পর্যন্ত এসেও আবার ফিরে দাঁড়ালাম, বললাম—তোমার বড় বোন পাগল ? ছেলে মারা যেতেই এরকমটা হয়েছে বুঝি ?

মুখখানা সেইভাবে রেখেই মাথা নেড়ে কোনক্রমে জানালো—হ্যাঁ।

চলে এলাম ঘরে। টেবিলে বসে কাজ করতে ভাল লাগল না। উঠে আবার বাইরে এলাম। এসে বসলাম গিয়ে মাঝের ঘরে। যোগীন্দ্রের মেয়ে টের পেয়ে বেরিয়ে এলো। এসে, চলে গেল আমার ঘরের ভিতর। ঐ যে ঘরটা পরিষ্কার করতে বলেছি, সেই কাজেই বোধহয় মগ্ন হয়ে গেল সে।

অনেকক্ষণ পরে ঘর থেকে বেরুলো মেয়েটি। মাঝের ঘরের দরজার সামনে এসে বললে—যান বাবু ঝাঁট দিছি।

বললাম—ওদিকে ভাত ধরে গেল কিনা দেখ গিয়ে।

—না—না, ধরবে ক্যান এত্তিবেলায়!—বলে, প্রায় ছুটেই চলে গেল রান্নাঘরে। আমার ঘরে এসে দেখি, ঘরের শ্রী সত্যিই খানিকটা ফিরে গেছে। টেবিল গোছানো, বিছানাটা টান্ টান্ করে পেতে চাদর মেলে দেওয়া আছে। পায়ের কাছে কম্বলটা পাতা। মাসটা কার্তিক, শীত ঠিক না পড়লেও চাদর দরকার হয়, শেষরাত্রে চাদরও চলে না, কম্বল দরকার হয়।

যাই হোক, প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে দেখি, ঠুক ঠুক করতে করতে যোগীন্দ্র আসছে।

বললাম—এসো।

গোলাপী রঙের তাঁতের একটা শাড়ী এনেছে, সায়াও এনেছে। বললে—চারগণ্ডা পয়সা ফির‍্যাছে বাবু।

—কীসের? বাজারের?

বললে—না। বাজারের ন'আনা ফির‍্যাছে, আর কাপড়ের চাইর আনা।

বললাম ন'আনা আমাকে দাও। চার আনা তোমার কাছে রাখো। আর শাড়ী-সায়া তোমার মেয়েকে দিয়ে এসো। বাজার কোথায়?

—রান্নাঘরে।

বললাম—যাও, রান্নাঘর থেকে তোমার চা নিয়ে এসে বসো দেখি। কথা আছে।

চলে গেল। ফিরে এলো একটু পরেই। বললাম—কই হে তোমার চা কই?

—দিতাছে।

বলে, বৃদ্ধ বসে পড়ল কাঠের মেঝের ওপর। আসতে-যেতে তার যে বেশ পরিশ্রম হয়েছে, এ তার মুখ দেখলেই বোঝা যায়। আমি

উঠে বাক্স খুলে একটা পুরানো ধুতি, সার্ট আর গেঞ্জিটা বার করে যোগীন্দ্রর কাছে রাখলাম। বললাম—রাখো। পরবে।

বৃদ্ধের চোখ দুটি ছলছল করে এলো। আবেগে কণ্ঠ বুঝি রুদ্ধ হয়ে গেল, কী বলতে গেল, মুখ ফুটে বলতেও পারল না।

বললাম—ঠিক আছে, তুমি স্থির হয়ে বসো দেখি।

বসল। কয়েক মুহূর্ত পড়েই ঘরে এসে দাঁড়ালো লক্ষ্মী, সদ্য কেনা গোলাপী শাড়ীটা পরে। কপালে, ঠোঁটের ওপরে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমেছে। হাতে দু'খানি করে রবারের চুড়ি, আর কোথাও কোনো অলঙ্কার নেই, কিন্তু হঠাৎ দেখে মনটা প্রসন্ন হয়ে আসে। সে এসে বাপের সামনে ঠক করে রাখল কাঁচের গেলাসে চা।

বললাম—শুধু চা? বাবাকে কিছু খেতে দেবে না?

—চা ছাড়া বাবা কিছু খায় না।

বলে, লক্ষ্মী চলে যেতেই সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম—সে কী হে!

চায়ে চুমুক দিয়ে যেন একটু আরাম পেলো বৃদ্ধ, বললে—বাবু দিনে-রাতে কয়েক কাপ চা পেলেই আমার চলে যায়। আর কিছু মুখে রোচেও না।

—সে কী! বলি, ভাত খাও ত?

চুপ করে রইল বৃদ্ধ। বিস্ময় আমার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল, বললাম—ভাত খাও না?

—খাই। মাঝে সাঝে।

নিস্তেজ, নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বর।

এক মুহূর্ত থেমে থেকে ব্যাপারটা বুঝে নিতে চেষ্টা করলাম। তারপর বলে উঠলাম—কাল এখানে ভাত খেয়েছিলে?

চুপ করে রইল। বিস্ময় যেন আমার আর সীমারেখা মানতে চায় না। বলে উঠলাম—খাওনি?

একটু হাসল—বললে—খাবোনে। দু'একদিন অন্তর-অন্তর একমুঠো পাইলেই আমার চলে যাবে নে।

বললাম—কাল খাওনি তাহলে?

বললে—বাবু, মেয়ে দুইডার পেটে কিছু দিতে পারি না, তয়, আমি মুখে দিই কী? কাল লক্ষ্মীর ভাত দুইজনে খুব তৃপ্তি কইরা খাইছে। আমার কী? আমার এই চাটুকুতেই চলিয়া যায়। বিশ্বাস করেন বাবু, কোন কষ্ট হয় না।

কথা বলতে পারছিলাম না, মনে হলো কী এক অবরুদ্ধ আবেগ আমার কণ্ঠস্বরটাকেও বুঝি রুদ্ধ করে দিতে চায়। কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে প্রশ্ন করলাম—আচ্ছা, যোগীন্দ্র? চাকরী ত তোমার বড়ো জোর এখানে মাস খানেক, তারপরে করবে কী?

তেমনি নিরুদ্বেগ হাসি ফুটে উঠল মুখে, বলল—চা-বাগানের এক মনিষ্যি আসা-যাওয়া করে বাবু। লক্ষ্মীরে নিতে চায়। যামু?

—তারপর?

নিরুত্তরে আবার একটু হাসল বৃদ্ধ, চায়ে চুমুক দিতে লাগল। আমি ডেকে উঠলাম—লক্ষ্মী—লক্ষ্মী?

ডাক শুনে লক্ষ্মী ত্বরিতপায়ে এসে দাঁড়ালো ঘরের দরজায়। বললাম—লুচি ত করেছিলে? বাপকে দাও নি কেন?

একটুক্ষণ থেমে থেকে দম নিয়ে বললে—বাপে খাবে না।

—দিয়ে দেখতে, খায় কি না খায়।

সেই একই উত্তর—খাবে না।

বৃদ্ধর মুখে তেমনি হাসি। লক্ষ্মীর মুখের দিকে তাকালাম, বললাম তুমি চা খেয়েছ ত? না, খাওনি?

মেয়ে মুখ চুন করে রইল। বৃদ্ধ বলে উঠল—খাওনের কথা কি মাইয়া মানসে মুখে আনতে পারে। খাবে না কেন? খাবে। ভাত হউক, চাড্ডি ভাত খাবেনে একেবারে।

মেয়েটিকে লক্ষ্য করে বললাম—চা খাও না?

চুপ করে রইল। উত্তর দিলো বৃদ্ধ, বললে—বাবু, এনে থিক্যা

আপনার খরচান্ত করতে আছি, এই কাপড় রে, জামা রে। আপনে অতো ভাববেন না আমাগো জন্য, লজ্জা পাই।

ঈষৎ বিরক্তির স্বরেই বলে উঠলাম—কিন্তু আমি ভিক্ষে ত দিচ্ছি না। কাজ করবে, খাবে। কী লক্ষ্মী, সকালে চা না খাও, কিছু জলখাবারও মুখে দিয়েছিলে ত?

লক্ষ্মী আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, তাড়াতাড়ি ছুটে গেল রান্নাঘরে।

আমি ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছি। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন ধীরে ধীরে খারাপ হয়ে আসছে আমার কাছে। আর, যতো স্বচ্ছ হয়ে আসছে ততই অবাক হচ্ছি। জল খাবার ত দূরের কথা, লক্ষ্মী বোধ হয় পেট ভরে ভাতটুকুও খাবে না। ঐ যে ব্যবস্থা হয়েছিল, মাসে দশটাকা আর একজনের ভাত-কাপড়। সেই জন্য, তার বেশী এক কপর্দকও এরা নিতে চাইবে না। সকাল বিকেল চা-টুকু মাত্র নিজের জন্য রেখে, একজনের মতো ভাত-তরকারীটুকু দুই মেয়ের মধ্যে ভাগ করে দেবার বন্দোবস্ত করেছে বৃদ্ধ।

বলে উঠলাম—তুমি আমার সঙ্গে এসো দেখি যোগীন্দ্র?

বিস্মিত হয়ে উঠে দাঁড়ালো, বললে—কোথায় বাবু?

—এসো আমার সঙ্গে।

চীৎকার করে বললাম—লক্ষ্মী, আমরা বেরুচ্ছি ঘরদোর দেখো।

ওকে নিয়ে চলে এলাম আমার বাড়ীর সীমানা পেরিয়ে পথের ওপর। বললাম তোমার বাড়ি কোথায়? চলো দেখি আমি দেখব।

একটুক্ষণ ইতস্তত: করবার পর আমাকে অবশেষে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলতে লাগল বৃদ্ধ। খুব দূরে নয়, বৃদ্ধের ধীরে ধীরে চলবার দরুণ মিনিট পাঁচেক লাগল, দ্রুতপায়ে এলে আরো কম লাগত। কিন্তু কি দেখলাম এসে? জঙ্গলের মধ্যে নিবিড় বন ঘেঁষে দরমা দিয়ে খুপরী মতো বানানো, মাথা নীচু করে অতিকষ্টে ঘরের মধ্যে ঢুকতে

হয়। আমাকে দেখে দুটি বিস্ফারিত চোখে পাগল মেয়েটি চীৎকার করে উঠেছিল—কে ?

সে চীৎকারে ভয় পেয়ে আমি পেছিয়ে এসেছিলাম। এসে, একেবারে ঘরের বাইরে। ডেকে বললাম—যোগীন্দ্র ?

যোগীন্দ্র বাইরে এলো। বললাম—এভাবে মানুষ থাকতে পারে ? জন্তু জানোয়ারের ভয় নেই ?

বললে—আছে বাবু। তিনটি প্রাণী খুবই ভয়ের মধ্য দিয়া রাত কাটাই।

বললাম—কিন্তু, এই যে শুনেছি, তোমাদের কত সব সাহায্য—

অল্প একটু হাসল যোগীন্দ্র, বললে— হ্যাঁ, সাহায্য দিচ্ছে, নয় ত চালা উঠাইলাম কী কইরা! কম্বল দিছিল, কাপড়চোপড় দিছিল। ছিঁড়া গেছে।

কথা বলছি দু'জনে, ইতিমধ্যে খোলা দরজা দিয়ে জন্তুর মতো মাথা নীচু করে একপ্রকার হামাগুড়ি দিয়েই বেরিয়ে এলো মেয়েটি। আমারই কিনে দেওয়া সেই শাড়ী-সায়া পরা, চোখ দুটি বড়ো বড়ো—চারিদিকে বৃত্তের মতো ঘন কালি পড়েছে! মেয়েটি লক্ষ্মীর মতো রোগা নয়, এমন কি মনে হলো, লক্ষ্মীর থেকেও গায়ের রং ওর ফরসা!

বললাম—যোগীন্দ্র, মেয়ের হাত ধরে আমার বাড়ী চলো। ওখানেই তোমরা থাকবে। বেড়ার ধারে চালা উঠিয়ে নিতে পারবে না ?

—তা পারব বাবু।

বললাম—তাই করবে। আপাততঃ নীচের ঘরটাতে গিয়ে উঠবে চলো, আমি জন ডেকে পরিষ্কার ক'রে দিচ্ছি।

যোগীন্দ্র বললে—কিন্তু, মাস গেলে কি করব বাবু? তখন ত যাইতে হইবে চা-বাগানে।

—সে দেখা যাবে। এখন এসো দেখি ?

ব'লে, হনহন করে চলে এলাম তাড়াতাড়ি। যোগীন্দ্রর হাঁটতে

দেরী হয়, তার জন্য দেরী না করে দ্রুতপায়ে চলে এলাম বাড়ি। গেট্ খুলে ভিতরে আসছি, দেখি, ওপরে বারাণ্ডার রেলিং ধরে উৎসুক নেত্রে পথের দিকে তাকিয়ে,—দাঁড়িয়ে আছে,—লক্ষ্মী।

আমি এগিয়ে সিঁড়ির কাছ পর্যন্ত এসেছি, লক্ষ্মী অমনি চট করে সরে গেল।

ওপরে এলাম, টেবিল থেকে চাবির গোছাটা নিয়ে বারান্দা পেরিয়ে নীচে নেমে আসব, কী ভেবে থমকে দাঁড়ালাম, ডাকলাম—লক্ষ্মী?

মেয়েটি বারান্দার প্রান্তবর্তী রান্নাঘরটি থেকে তেমনি জড়োসড়ো ভঙ্গীতে বেরিয়ে এলো। বললাম—নীচের ঘরটা খুলে দিচ্ছি। তোমরা এসে সবাই থাকবে।

মেয়েটি বোধ হয় কথাটা বুঝল না, আমার মুখের দিকে বড়ো-বড়ো চোখ দুটি মেলে নির্বোধের মতো তাকিয়ে রইল।

বললাম—তোমার বাবার সঙ্গে তোমাদের বাড়ি দেখতে গিয়েছিলাম। ওভাবে মানুষ থাকতে পারে?

মুখ নীচু করে রইল।

বললাম—জন্তু-জানোয়ারের ভয়ও ত আছে। আছে না?

মাথা নেড়ে জানালো—হ্যাঁ।

—তবে?

মৃদুকণ্ঠে বললে—একদিন রাত্রে দরজায় ভীষণ ধাক্কা পড়েছিল।

—তারপর?

বললে—সকালে উঠে দেখি, দরজার বাইরে মাটির উপরে বড়ো বড়ো আঁচড়ের দাগ। বাঘ, না ভালুক কে জানে?

—তা হলেই বলো, ওখানে কি থাকতে পারে মানুষ? তোমার দিদিকে নিয়ে তোমার বাবা আসছে।

কৃতজ্ঞতায় দুটি চোখ বুঝি ছলছল করে এলো। এবং সেই চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে আমার এতক্ষণে মনে হলো, এই মেয়েটিরই

নীরব প্রেরণায় বুঝিবা হঠাৎ আমি এরকম পরোপকারে উৎসাহী হয়ে উঠলাম! কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো, তাই বা কি করে হবে? কা আছে মেয়েটির মধ্যে? সামান্য অশিক্ষিত একটি মেয়ে, অপুষ্ট চেহারা, রূপহীনা বললেই চলে।

মনে মনে এই সব উত্তর-প্রত্যুত্তর পর্যালোচনা করে চলেছি বটে, কিন্তু কোথায় যেন মেয়েটি সূক্ষ্ম এক আকর্ষণের জাল বিস্তার করে চলেছে, এ অনুভূতি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখি কী করে?

আমার চিরকালকার নারী-বিহীন ঘরে গোলাপী শাড়ী পরা এই মেয়েটির লঘু পদসঞ্চার, সেই অনুভূতিই কি এই প্রেরণা সঞ্চারের মূলে? কে জানে!

বললাম—লক্ষ্মী?

উত্তর দিলো—কী বাবু?

—কী রান্না করছ?—একটু নীচে আসতে পারবে?

কী ভাবল কে জানে, বলল—আপনি যান, আমি এখ্খুনি আসছি বাবু।

নীচে এলাম। তালা খোলামাত্রেই মনে হলো, একটা বিশ্রী বদ্ধ বাতাস যেন মুহূর্তে মুক্তি পেলো! সাইকেলটি ছিল এক পাশে, সেটাকে বাইরে এনে ঘরের জানলাগুলি একে একে খুলে দিলাম। ঘরখানা খারাপ নয়, মাঝারী আকারের ঘর, ইটের গাঁথুনী, মাথায় টিনের চাল। কাঠ কাঠরা, এটা সেটা স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে আছে। তাকিয়ে তাকিয়ে সেই সব দেখছি, ইতিমধ্যে লক্ষ্মী এসে ঘরে দাঁড়ালো, হাতে সম্মার্জনী।

বললে—আমি যাব বাবু, আমি ঘরটা ঠিক কইরা দিতাছি।

একটু অবাক হয়েই তাকালাম ওর দিকে, বললাম—তুমি একা পারবে?

—পারব অনে।

বলে, সঙ্গে সঙ্গেই কাজে লেগে গেল।

তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম—দাঁড়াও, দাঁড়াও, হুট করে কাঠ কাঠরায় হাত দিও না, বিছে টিছে থাকতে পারে। 'বিছে'র কথায় স্বাভাবিক ভাবেই একটু পিছিয়ে এলো। তারপরে, মুখটা নীচু করে বললে—বিছার ভয় আমাগো নাই।

—কেন ?

ম্লান একটু হাসল, বললে—সোরভোগের বাড়িতে কতো বিছা ছিল! বড়ো বড়ো কাঁকড়া বিছা! কতো মারছি! বলে, এগিয়ে গিয়ে স্তূপীকৃত কাঠগুলি একে একে নামাতে লাগল লক্ষ্মী, নামাতে নামাতে হঠাৎ এক সময় একটা ছোট কাঠ ধ'রে নাড়া দিতে কতোগুলি কাঠ একসঙ্গে হুড়মুড় করে পড়ে গেল!

আমি তাড়াতাড়ি ওর কাছে সরে এলাম বটে, কিন্তু কাঠ নয়, যা' দেখে ভয় পেয়ে চীৎকার করে ওর হাতখানাই ধরে ফেলে ওকে দরজার কাছে সরিয়ে আনলাম মুহূর্তে, সে হচ্ছে—সাপ। কী সাপ বুঝলাম না, খুব বড়ো নয়, কিলবিল করতে করতে এক লহমায় অন্য একটা স্তূপের মধ্যে ঢুকে গেল!

বুকের ভিতরটা আমার তখনো ঢিপ ঢিপ করছে। ওর হাতের ছোট্ট মুঠিটুকু আমার হাতের মধ্যে ধরা, আমি একটু টান দিয়ে ওকে একেবারে দরজার বাইরে নিয়ে এলাম। বললাম—এখ্‌খুনি মরেছিলে সাপের কামড়ে! ধীরে ধীরে হাতটা ছাড়িয়ে নিলে লক্ষ্মী, বললে—সাপের ভয় করলে চলে!

বলে, আবার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল, আমি পিছন থেকে আবার ধ'রে ফেললাম ওর হাতখানা, বললাম—না, যেও না।

আমার ভাব দেখে বোধহয় নিজের মনেই একটু হাসল, বলল—বাবু ভয় পাইতাছেন? কিছু হইব না। ঘরখান ত সাফ করন চাই!

বললাম—করতে হবে না সাফ। আমি জন' ডেকে আনছি।

বললে—এই এত বেলায় জন' পাইবেন কই আপনে? সব মাঠে গেছে গিয়া।

আমরা কথা বলছি, ইতিমধ্যে গেট খুলে ভিতরে এলো যোগীন্দ্র আর সরস্বতী। ওদের আবির্ভাব টের পেয়েই হাতটা চট করে ছাড়িয়ে নিলো লক্ষ্মী।

তাকিয়ে দেখি যোগীন্দ্রর হাতে একটা ভাঙা টিনের বাক্স আর খান দুই ছেঁড়া মাদুর। আর সরস্বতীর হাতে একটা বড়ো কাপড়ের পুঁটলী। বললাম—এই নাকি তোমাদের সব জিনিষপত্র ?

বললে—আর দু'একখানা মাটির হাঁড়ি-কুড়ি আছে বাবু, নিয়ে আস্‌ছি।

হাতের জিনিষপত্র নামিয়ে রেখে যোগীন্দ্র লক্ষ্মীর মুখের দিকে তাকালো, জিজ্ঞাসা করলে—কি হইছে ?

তার উত্তর লক্ষ্মী যে-ভাষায় কথা বলতে লাগল এবং তার বাবা তার সঙ্গে যে ভাষায় উত্তর-প্রত্যুত্তর করতে লাগল তার মধ্যে এক সাপ' শব্দটার উল্লেখ ছাড়া আর বিন্দুবিসর্গ আমি বুঝতে পারলাম না! অবাক হয়ে ভাবছিলাম ওরা বাঙলা ভাষাতেই কথাবার্তা বলছে ত না অন্য ভাষায় ?

সরস্বতী ততক্ষণে জিনিষপত্র নামিয়ে রেখে অবাক হয়ে চারিদিকে দেখছে। মোটামোটা খুঁটির ওপরে কাঠের ঘরগুলি বসানো, পাশ দিয়ে কাঠের সিঁড়ি। নীচে একদিকে টিনের চালা-ছাওয়া ঘরখানা অন্যদিকে কাঠের বেড়া দেওয়া বেশ বড়ো—বাথরুম। আমাদের এ বাংলোবাড়ির বিশেষত্ব এই যে ঐ কাঠের বেড়ার আড়ালে টিউব-ওয়েল রয়েছে।

যাই হোক, সরস্বতী মেয়েটি ওর বোনের মতো নয়। মাথায় বোনের থেকে একটু বড়ও বটে। রঙ এদের সবারই ফর্সা ছিল এককালে, অযত্নে-অবহেলায় কী রকম তামাটে হয়ে গেছে। সরস্বতীর চোখ দুটি বড়ো-বড়ো, শুধু চোখের চার পাশে কালি পড়েছে বৃত্তাকারে।

বাড়িঘর দেখতে-দেখতে এক সময় তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো আমার

দিকে। প্রথমে কেমন যেন অবাক হয়েই দেখতে লাগল, তারপর আমিও তার দিকে তাকিয়ে আছি লক্ষ্য করে হঠাৎই কী আশ্চর্য ফিক্ করে একটু হেসে ফেললে।

আমি এ সবে লজ্জা পাবার মানুষ নই, কিন্তু ওর হাসি দেখে সত্যিই কেমন লজ্জা আর সংকোচে যেন মরে গেলাম। মুখটা ফিরিয়ে লক্ষ্মীদের দিকে তাকিয়েছি কিন্তু ওরা আমাকে লক্ষ্য করবে কী? ওরা ওদের সেই অদ্ভুত ভাষায় তখনো বাক্যালাপ করে চলেছে।

এক সময় দেখি, লক্ষ্মী ছুটে ওপরে চলে এলো এবং পরক্ষণেই নেমে এলো একটা লাঠি নিয়ে। সে লাঠিটা হাতে নিয়ে যোগীন্দ্র ঘরের ভিতরে ঢুকতে গেল।

পিছন থেকে ডেকে উঠলাম—যোগীন্দ্র?

যোগীন্দ্র ফিরে দাঁড়িয়ে বললে—ভাববেন না বাবু, সাপটারে মাইরা ফেলতাছি। এবং তারপরে সত্যি সত্যিই দেখি বাপ আর বেটিতে ভিতরে ঢুকে কাঠের স্তূপ নামিয়ে-নামিয়ে বাইরে আনতে লাগল। আসলে, মেয়েই কাজ করতে লাগল, যোগীন্দ্র লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে রইল কাছে। লক্ষ্মী কাঠ নিয়ে বাইরে আসছে, রাখছে, আবার ভিতরে যাচ্ছে। আমাকে বললে—বাবু, বইনেরে দেখবেন। ভিতরে না আইসা পড়ে।

সরস্বতীর মাথায় বোধহয় কিছুই যাচ্ছিল না! নতুন একটি যায়গায় এসে সে যেন বিহ্বল হয়ে গেছে! অথচ, আশ্চর্য্য, তার দিকে যদিই বা কখনো চোখ পড়ে যাচ্ছে, ত এমনি মুখ-টিপে-টিপে হেসে উঠছে! এ কী ধরণের পাগল!

লক্ষ্মী আসতে-যেতে আরেকবার আমার সঙ্গে কথা বলল। বলল—বাবু, আজ আপনার খাইতে দেরী হইয়া যাইবে।

বললাম—তাহোক, কিন্তু খুব সাবধান। যোগীন্দ্র মারতে পারবে ত সাপটাকে? এর কিছুক্ষণ পরেই, ভিতর থেকে লক্ষ্মী চীৎকার

করে উঠল 'সাপ'-'সাপ' বলে। এবং সেই চীৎকারে আমি ভিতর দরজার কাছে গেছি, সরস্বতী বসে পড়ছিল, উঠে দাঁড়িয়েছে। সাপটা কোথা থেকে তেড়ে এসেছে ওদের দিকে, কিন্তু যোগীন্দ্র তাকে আঘাত করবে কী, তার হাতই ত কাঁপছে থর থর করে।

বোধহয় সব-কিছু ঘটে গেল এক লহমার মধ্যে। লক্ষ্মী মুহূর্তে বাপের হাত থেকে লাঠিটা ছিনিয়ে নিয়ে সাপের মাথায় মারল প্রচণ্ড এক ঘা।

আমরা সব বাইরে বেরিয়ে এসেছি। ঐ মেয়েই লাঠির মাথায় মৃত সাপটিকে নিয়ে বাইরে এনে রাখল। ততক্ষণে 'সাপ-সাপ' চীৎকার শুনে কয়েকটি লোক বাইরে থেকে ছুটে এসেছে। এবং ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, একটি নয়, সাপ ছিল এক জোড়া। দুটিকেই মারল লক্ষ্মী নিজের হাতে। লোকে মৃত সাপ দুটিকে পুড়িয়ে ফেলতে-ফেলতে নানারকম জল্পনা করতে লাগল, কেউ বললে—বিষাক্তসাপ। কেউ বললে—সাপ চেনাচ্ছ? অঁয়ের বিষ নাই।

কেউ বললে—চিতি।

কেউ বললে—অঁয়-অঁয় শঙ্খের ছা।

একজন উৎসাহী বৃদ্ধ আমার কাছে এগিয়ে এসেছেন, বললেন—তামাকবাবু, ইঁয়ারা কারা? কোন্ঠে আয়েছেন?

সংক্ষেপে জানালাম—আমার আত্মীয়। এবার থেকে আমার কাছে থাকবেন।

বৃদ্ধটির সঙ্গে অন্য দু-একজন সঙ্গে সঙ্গে প্রবৃত্ত হলো বাক্যালাপে। আমার সঙ্গে কথাবার্তায় এঁরা 'পশ্চিমা' ভাষা বলবার চেষ্টা করলেও নিজেদের মধ্যে খাঁটি উত্তরবঙ্গীয় 'বাহে' টান শুরু করেছেন। বৃদ্ধকে অপরেরা যা বোঝাতে লাগলেন, তার মর্মার্থ হলো—এই যে তিনটি প্রাণী, বুড়ো আর তার মেয়ে দুটি, এরা তামাক-বাবুর কেউ হন না, ঐদিকে জঙ্গলে বাস করতে এসেছিল, তামাকবাবু তা দেখে দয়াপরবশ হয়ে ওদের নিয়ে এসেছেন নিজের বাড়িতে।

কিছুক্ষণ পরেই ওঁরা অবশ্য সব চলে গেলেন নিজের নিজের কাজে, কিন্তু আমার কাছে যেটা কৌতুককর লাগছিল, সেটা হচ্ছে আমার নামকরণটা। বাইরে ওদের কাছে যে আমি "তামাক-বাবু" হয়ে গেছি ওটাও ঠিক জানতাম না। যে-সব রায়তের সঙ্গে আমার যোগাযোগ তারা আমাকে ডাকে অন্য নামে। বলে—'নেস্‌পেক্টর বাবু'। কেউ কেউ আবার 'দারোগাবাবু'ও বলে। কিন্তু 'তামাকবাবু' কথাটা শুনলাম এই প্রথম।

কাঠগুলিকে বাইরে একদিকে স্তূপাকার করে রেখে, ঘরদোর ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে ওরা যখন বাসযোগ্য করে তুললো, তখন প্রায় সন্ধ্যা। এর মধ্যে আমার খাওয়া-দাওয়া হয়ে গিয়েছিল যথারীতি। এবং বাড়ি ছিলাম বলেই ব্যাপারটা লক্ষ্যে পড়ল, ঠিক এক মুঠো ভাত মুখে দিলো যোগীন্দ্র, আর দুই বোনে ভাত নিলো মাত্র একজনের। অর্থাৎ একজনেরটাই ভাগ করে দু'জনে খাবে।

তখন আর কিছু বলিনি, বললাম সন্ধ্যার আগে, লক্ষ্মী যখন চাল ধুতে কলের দিকে গেল, তখন। ডেকে বললাম—এবেলা থেকে চারজনের চাল নেবে বলে দিলাম। তোমরা তিনজনেই আমার কাজ করবে, তাহলেই হবে। তোমার বাবা করবে বাইরের কাজ, তোমরা দুই বোন করবে ভিতরের কাজ। আর আমার কাছে বাড়তি কম্বল আছে, তিনখানা বার ক'রে নিয়ে যাও। ওভাবে মানুষ থাকে ?

লক্ষ্মী মুখ নীচু করে সব শুনে গেল, কিছু বলল না।

বললাম—চুপ করে আছ কেন ? যাও ঘর থেকে আরও চাল নিয়ে এসো। কই যাও ?

মুখ তুলে ক্লিষ্ট কণ্ঠে লক্ষ্মী বলে উঠল—এতো সব করেন কেন বাবু, আমাদের জন্যে ?

ধম্‌কে বললাম—সে তোমার জানবার দরকার নেই। যা বল্‌ছি, করো।

সন্ধ্যার পরে, হ্যারিকেন, সেজবাতি, এসব জ্বেলে ওঠার পালার

পর লক্ষ্মী এলো চা নিয়ে আমার ঘরে। সেই গোলাপী শাড়ীখানি পরা, মুখখানা বোধ হয় জল দিয়ে ধুয়ে এসেছে, বেশ স্নিগ্ধ লাগছে মুখখানা।

বললাম—চা বেশী করে করেছ ত?

চুপ করে রইল। বললাম—ঐ ত তোমার দোষ। কথা জিজ্ঞেস করলে চুপ করে থাকো।

বললে—বাবাকে দিতাছি।

—আর তোমরা?

—আমি খাই না।

—তোমার দিদি?

চুপ করে রইল। বললাম—দাওনি বুঝি দিদিকে? যাও দিয়ে এসো।

চলে গেল। আমি চায়ের পালা শেষ করে উঠে দাঁড়ালাম, মনে হলো নীচে গিয়ে ওরা কেমন ভাবে শোয়া-থাকার ব্যবস্থা করেছে, সেটা একবার দেখে আসা দরকার। যে ঘর থেকে সাপ বেরিয়েছে, সে ঘরে নির্ভয়ে রাত কাটানো কি সোজা কথা?

ধীরে ধীরে নেমে এলাম নীচে। ঘরে একটা হ্যারিকেন জ্বলছে এক পাশে, অন্যদিকে দরজার কাছ ঘেঁষে, মাদুরের ওপরে বসে আছে যোগীন্দ্র। আর হ্যারিকেনটা যে-দিকে রাখা আছে, তার কাছে অপর একটি মাদুরের ওপরে পা ছড়িয়ে বসে আছে সরস্বতী। তার কাছে কাঁচের গেলাসে—চা। তার পায়ের কাছে কম্বলগুলি জড়ো করা।

ডাকলাম—যোগীন্দ্র?

নিজের মনে নিঝুম হয়ে কী যেন ভাবছিল সে, আমার কথায় ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালো, বললে—বাবু?

—ব'সো-ব'সো।—বললাম—ঘরের মধ্যে ফুটো টুটো যা ছিল, সব বন্ধ করেছ ত?

যোগীন্দ্র বললে—আমি ত চোখে তেমন দেখি না বাবু, লক্ষ্মী

বলল, ঘরে কোনো ফুটা-টুটা নাই, আছে শুধু নর্দমার ফোকর, তা হেইটা সে ইট দিয়া বন্ধ কইরা দিছে। না বাবু, ভাববেন না, সাপ আর আসব না, শীত পইরা আইল, তাই আইস্যা কাঠ কাঠরার মইধ্যে আশ্রয় নিছিল। আশ্রয় ত হক্কলেই খোঁজে বাবু!

বললাম—মশা কেমন?

উত্তর দিল—শীত পইরা আইল, মশা ত কম হইবেই। তয় আছে, কিছু আছে।

বললাম—মশারী ত নেই। এক কাজ করো, ওপরে যাও দেখি চট্ ক'রে। আমার ঘরে মশা মারবার যন্ত্রটা আছে। ওটা নিয়ে এসে ঘরের চারধারে স্প্রে করে দাও, স-ব মশা পালাবে। দেখলে না? আমি কি ওপরে মশারী খাটাই?

যোগীন্দ্র দাঁড়িয়েই ছিল। বললে—আপনার দয়া আমরা ভুলব না বাবু। কিন্তু, এত কর্‌তাছেন ক্যান? জঙ্গলের ধারে আমাগো খুপ্‌রী ত দেইখা আইছেন, ঐখানে ত সন্ধ্যা হইলেই মশার ঝাঁক আইস্যা ঘরে ঢোকে!

বললাম—তা হোক। তুমি যাও। নিজে না চিনতে পারো, লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা কোরো, লক্ষ্মী জানে। ও আমাকে স্প্রে করতে দেখেছে!

চলে গেল যোগীন্দ্র। সরস্বতী ততক্ষণে মুখ ফিরিয়ে এক দৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছে! সে চোখে শঙ্কা কি কৌতূহল ঠিক বোঝবার উপায় নেই, তবে এমন একটা কিছু ছিল, যা থেকে চোখ ফেরানোও যায় না। জানি না সাপের দৃষ্টি কেমন, কিন্তু মনে মনে সাপের দৃষ্টির উপমাটা ব্যবহার করতে ইচ্ছা করলো।

ঠিক ওই পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। সরস্বতী করলো কী, আমার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই উঠে দাঁড়ালো, তু'পা এগিয়েও এলো; তারপরে, হঠাৎ মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল।

আমি চরিত্রবান নই, তবু বুকের মধ্যে দিয়ে কী-এক আতঙ্কের

হিমস্রোত প্রাবাহিত হয়ে গেল। ভাবলাম অমন করছে কেন? কী ও করতে চায়?

কথা বলতে গিয়ে গলাটা যেন শুকিয়ে আসছে মনে হলো। বললাম—উঠলে কেন? বোসো?

পাহাড়ী ঝর্ণার মতো হাসির একটা স্রোত বইয়ে দিলো মুহূর্তে, চাপা একটা উদ্বেলিত হাসি। তারপরে, তেমনি চাপা কণ্ঠস্বরেই বললে—আসো না? আসো।

সম্মোহিতের মতো বলে উঠলাম—কোথায়।

সরস্বতী এবার যা করলে, তা অভাবনীয়। তেমনি হাসতে হাসতে হঠাৎ বুকের আঁচলটা টান দিয়ে এলোমেলো ক'রে দিতে গেল। আমি সু-চরিত্রের মানুষ নই, তবু সইতে পারলাম না, আমার কানের কাছটা মুহূর্তে উষ্ণ হয়ে উঠল, মুখ ফিরিয়ে দ্রুত চলে এলাম ঘর থেকে।

যোগীন্দ্র তখন স্প্রে-টা হাতে দিয়ে নেমে আসছিল, আর লক্ষ্মী ছিল বারান্দায় দাঁড়িয়ে। আমি রুদ্ধকণ্ঠে ডেকে উঠলাম—যোগীন্দ্র?

—কী হয়েছে বাবু!

লক্ষ্মী কী ব্যাপারটা কিছু আঁচ করতে পেরেছে? সে দ্রুত পায়ে নেমে এলো সিঁড়ি দিয়ে, বাপকে ঠেলা দিয়ে সরিয়ে, আমার গা ঘেঁষে পড়ি-কি-মরি করে ছুটল ঘরের দিকে।

আমরা দু'জন সিঁড়ির ওপরেই দাঁড়িয়ে আছি। লক্ষ্মী ঘরে যাওয়ার পর, কী যেন নিজেদের ভাষায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বোনকে বলতে লাগল ঠিক বুঝতে পারলাম না। শুধু বার কয়েক 'কাপড়' কথাটা যে উচ্চারণ করেছে লক্ষ্মী, ওটা অবশ্য বুঝতে পেরেছিলাম। লক্ষ্মী 'কাপড়' 'কাপড়' করে কি সব বলছে, আর খিলখিল করে বাঁধ ভাঙা ঝর্ণার মতো হেসে উঠছে সরস্বতী।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। বোনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এক সময় দরজার কাছে এসে দাঁড়াল লক্ষ্মী, বললে—বাঁ?

বাপকে মাঝে মাঝে বাঁ বলে লক্ষ্মী, এটা আগেই বুঝেছিলাম। কিন্তু বাঁ কথাটা উচ্চারণ করে কী সব যে বললে বুঝলাম না। তার উত্তরে যোগীন্দ্র দ্রুতপায়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। অবাক হয়ে ব্যাপারটা অনুধাবন করার চেষ্টা করছি, ইতিমধ্যে দেখি আমার লাঠিটা অন্য হাতে নিয়ে যোগীন্দ্র নেমে আসছে। আরও অবাক হলাম। বললাম—কী হবে।

যোগীন্দ্র বললে—লক্ষ্মীকে দিয়ে আসি বাবু।

বলে, এগিয়ে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়ানো লক্ষ্মীর হাতে সত্যিই দিয়ে এলো লাঠিটা। আমি সিঁড়ি থেকে নেমে কয়েক পা এগিয়ে গেছি ওদের ঘরের দিকে ততক্ষণে। যোগীন্দ্র দরজা ছেড়ে আমারই দিকে চলে এসেছে। কিছু প্রশ্ন করবার আগেই, ঘরের ভিতরে একটা দুপদাপ শব্দ আর সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্ত চীৎকার।

—কী হলো।

যোগীন্দ্র বললে—যাবেন না বাবু, এইখানে খাড়া হন। মইধ্যে মইধ্যে ওরে দুই এক ঘা না দিলে ও সজুত হয় না।

সবিস্ময়ে বললাম—বলছ কী! লাঠি দিয়ে লক্ষ্মী ওকে মারল।

—হ্যাঁ বাবু, মারতে হয়।

—কেন?

যোগীন্দ্র বললে—আপনারে আর বলব কী, মাঝে মাঝে মাইয়ার আমার এমন হয় যে, পরনের কাপড়টা পর্যন্ত খুলে ফেলে। তখন ওকে লক্ষ্মী ছাড়া আর কে সামলাবে বলেন? আমার ত এখন এই-ই হয়েছে জ্বালা। পোড়ারমুখী মরলে আমার হাড় জুড়াত।

আর কোনো কথা বলতে পারলাম না। ধীর পায়ে উঠে এলাম ওপরে।

কিছুক্ষণ পরে সব যখন শান্ত হয়ে গেছে, টের পেলাম লক্ষ্মীও উঠে এসেছে ওপরে, তখন দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে ডাক দিলাম—যোগীন্দ্র?

যোগীন্দ্র বোধহয় সিঁড়ির শেষ ধাপে চুপচাপ বসেছিল অন্ধকারে আত্মগোপন করে, সাড়া দিয়ে বলে উঠল,—যাই বাবু।

ঘরে এসে দাঁড়াল একটু পরেই। বললাম—বসো।

বসলো মেঝের ওপরে। বিছানার ওপরে আমি কাত হয়ে শুয়ে আছি। প্রশ্ন করলাম—এখন কী করছে সরস্বতী?

গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে যোগীন্দ্র বললে—এখন মা আমার লক্ষ্মী মাইয়াডি। অর বইনে অরে একটু খাওয়াইয়া দিবো, ব্যস আর কী। মায়ের আমার দুই চক্ষু ভইরা নিদ্ আইস্যা যাইব। কোনো জ্বালা নাই বাবু, কোনো জ্বালা নাই, মাঝে মাঝে যে ক্যান অ্যামুন—

বললাম—আমারই দোষ। আমি তোমাদের ঘরে আচমকা না গিয়ে পড়লে—

তাড়াতাড়ি বলে উঠল যোগীন্দ্র—না বাবু—না। আপনের ঘরবাড়ি, আপনে যাইবেন না? অর ঐরকম হয় মাঝে মাঝে।

উঠে বসলাম বিছানায়, বললাম—আমাকে ও কি বলছিল জানো। আমাকে দেখে ও ফিক ফিক করে হাসছিল। তুমি চলে এলে, আর ও আমার সঙ্গে কথা বললে।

—কী কথা, বাবু।

একটু ইতস্ততঃ করে অবশেষে বলেই ফেললাম কথাটা। বললাম—বললে, আসো—আসো।

আমিও কথাটা শেষ করেছি, আর সঙ্গে সঙ্গে, কি আশ্চর্য, যোগীন্দ্র ছেলেমানুষের মতো একেবারে ডুক্‌রে কেঁদে উঠল, বলল—আপনি ওর দোষ ধববেন না বাবু, আপনে ওর দোষ ধরবেন না। আমি ওর জন্মদাতা পিতা, আমি ওর মনের দুঃখের কথাটা স—ব জানি। পাগলী মাইয়া আমার কি চায়, তা-ও জানি। কানু ছিল ওর চোখের মণি, কানুরে হারাইয়া ও যে—

আবেগে কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল বৃদ্ধর, কথাটা শেষ করতে পারল না।

বললাম—ছেলেকে ত কতো মা-ই হারিয়েছে, তা' বলে, এমন—এ-ঠিক—

বৃদ্ধ বাধা দিয়ে বলে উঠল—বাবু, শুধু ছেলেরে হারাইয়াই কি এমন পাগলডা হইছে।

—তবে?

বৃদ্ধ একটুক্ষণ থেমে থেকে, তারপরে বললে—তয় শোনেন।

যোগীন্দ্র বলতে শুরু করল। আমার সঙ্গে কথা বলল, তাই যথাসম্ভব আমাদের কথার ভঙ্গিতেই সে সব বলার চেষ্টা করতে লাগল। বললে—বাবু, পনেরো বছর আগেকার কথা কইতাছি। রেলে চইড়া মাইজদী কাছারীতে মাঝে মাঝে গেছি, আবার উত্তরে লোকসামও গেছি। আমাগো বাজরা থিক্যা দেড় ঘণ্টার পথ। কিন্তু, কী কমু বাবু, হঠাৎ গাঁয়ে একটা সোরগোল উঠল। কী না, দেশ স্বাধীন হইতেছে বটে, লেকিন, জিন্না-গান্ধীতে মারামারি লাগছে। পনেরো বছরের ডাগর মাইয়া সরস্বতী, আর পাঁচ বছরের শিশু ঐ লক্ষ্মী, দুইও জনেরে লইয়া ডরে কাঁপি। এই শুনি চৌমোহানিতে ভীষণ হাঙ্গামা হইতেছে। মাথায় যেন বজ্র পড়ল বাবু, চৌমোহানি ত ঘরের এক্কেবারে নিকটে। তারপরের কথা আর কী কইব বাবু ঘরদোর জ্বালাইয়া দিলো, এক কাপড়ে পলাইয়া আসলাম বাজরা স্টেশনে। গাড়ি সেনাইমুরিতে আইস্যা হৈ যা খাড়াইল আর নড়তে চায় না? গাড়ির মইধ্যে আমাগো মত মাইনষেতে ত গাদি দিছে। জানালার কপাট আর দরজা বন্ধ কইরা ঠক ঠক কইরা কাঁপি। কারা যে আইস্যা মাঝে মাঝে জানালায় ধাক্কা দিতেছে কে জানে! এই রকম ভয়ে ভয়ে বাবু, কোন ক্রমে লোকসাম আইসলাম। গাড়িতে যে-সকল মাইনষে ছিল, তারা বেবাক যাইবো চাঁদপুরে, হেইখানে স্টীমার ধইরা গোয়ালন্দ, গোয়ালন্দ হইয়া কইলকাতা। কিন্তু, কী কমু বাবু, আমি ক্যান, বহু মাইনষে চাঁদপুরের গাড়ি ধরতে পারল না। মাইনষে-মাইনষে একেবারে গরু ছাগলের ল্যাখান

গাদি দিছে। তখন, কী করা যায়? জনকয়েক মাইন্‌ষের সঙ্গে বইস্যা বইস্যা শলা করলাম। লাকসামে বেশীক্ষণ থাকতে ভরসাও হয় না। তাই পরের গাড়িতে চইরা আসলাম কুমিল্লা শহরে। এই কুমিল্লা স্টেশনে একটা দিন কাটাইছি বাবু। ডাগর মাইডারে লইয়া কী যে আতঙ্কে দিন কাটাইছি কী কমু? মাইয়ার আমার আজ এই হাল হইছে, কিন্তু দেখতে ছিল সোন্দর। এ আসিয়া মইয়ার খবর জিগায়, ও আসিয়া জিগায়, আমার মাথা যেন কেমন ঘুইরা গেল। তখনো যদি কুমিল্লা হইতে আবার লাক্‌সাম আসি, আইস আবার চাঁদপুর যাই, তা হইলেও কইলকাতা আসবার একটা পথ হয়। তা না কইরা আসলাম—আখাউড়া। আখাউড়া থিক্যা আগরতলা যাওন যায়, শুনলাম ত্রিপুরা পাকিস্তান হইব না। কিন্তু ভাগ্য যায় সাথে সাথে! এই আখাউড়া যখন আসছি তখন ত গাঁটের কড়ি ফুরায়ে আসছে! স্টেশনে এইদিকে ঐ-দিকে ঘুরতে আছি, মাইয়া দুইডার খাওনের কিছু ব্যবস্থা করা যায় কিনা দেখত্যাছি, ইর মইধ্যে আমাগো মাইজদীর উকিলসাহেবের এক ছেইলার সাথে দেখা। চিরটা কালই ত কোট পইরা সাহেব সাজে, ঢাকায় পড়াশুনা করে, দুইটা পাশও দিছে বুঝি! এহন দেখি, পাজামা-পাঞ্জাবী পরছে, ফেজ টুপি দিছে মাথায়, মুখে দাড়িও রাখছে। আমারে দেইখা যেন আকশে থে' পড়ল, কইল—যোগীন্দর, তুমি।

সেই অজানা অচেনা যায়গা—মাইন্‌ষের ভিড়—তার মইধ্যে একজন ত চেনালোক বাইরইল। তারে দেইখা, এক্কেবারে কাইন্দা পড়লাম। বিত্তান্তটা সংক্ষেপে কই বাবু, সে আমাগো লইয়া একেবারে তার বাসায় আইন্যা লুকাইয়া রাইখল? বলল—চুপচাপ থাক্‌বা—এক্কেবারে রা করবা না। দুইডা দিন থাকো, তারপরে ব্যবস্থা করতেছি। কোনো ডর নাই।

কইলাম—ছোডোবাবু, আগরতলা পৌঁছাইতে পারবেন আমাগো?

কইল—আ সর্বনাশ! ঐ পথে ভীষণ মারামারি-কাটাকাটি

হইতেছে। ডর নাই, আমি তোমাগো ঠিক যায়গায় লইয়া যামু—হেইখানে তোমাগো কোনো ডর থাকব না।

বাবু, যার কথা কইতেছি, তার নামডা আর শুইনেন না, 'ছোডো বাবু' বইলা ডাকতাম, হেই নামই শুইনা যান। ছোডোবাবুর বাসায় আমাগো অযত্ন ছিল না, 'ছোডোবাবু'র ব্যাভারে আমরা গইলা গেছিলাম। না হইলে, তিনদিন পরে যখন সন্ধ্যার সময় কইল,—'আসো যোগীন্দর, পলানোর লাগব আসো আমার সঙ্গে,'—তখন কি একটুও সন্দেহ করতে পারছি, যে' মনের ভ্রমে সয়তানের রাস্তায় পা ফেলছি! আখাউড়া থে আইলাম কিশোরগঞ্জ ছোডোবাবুর সাথে। কিশোরগঞ্জে নামিয়া ছোডোবাবুর সাথে আসলাম তার এক দোস্তের বাড়ি। এক দিন যায়, দুইদিন যায়, ছোডোবাবু একদিন রাত্রিবেলা ছুটতে ছুটতে ফিরলেন বাড়ি, কইলেন—শীগ্‌গির পালাও যোগীন্দ্র, তোমাগো কাটতে আসতেছে!

এই খবর শুইন্যা মনের মধ্যে কী হইতে পারে, তাত বুঝতেই পারেন। দোস্তের সাথে পরামর্শ কইরা ছোডোবাবু করলেন কি, সরস্বতীরে বোরখা পরাইলেন, লক্ষ্মীর পাজামা আর জামা, আমি কাপড়ডা পরলাম লুঙ্গির মতো কইরা। ছোডোবাবু বললেন—তুমি এক্কেবারে বোবা সাজিয়া যাও। কেউ কিছু জিগাইলে উত্তর দিও না। আসো আমার সাথে।

বিত্তান্ত সংক্ষেপে কই বাবু। পায়ে হাইট্টা সারাটা রাত পুয়াইয়া ফেললাম। আসলাম—হুসেনপুরে। এই হুসেনপুরে ছোডোবাবুর চেনাজানা এক মনিষ্যের বাসায় উঠলাম। কিন্তু, এই হুসেনপুরেই আমার সর্বনাশ হয়ে গেল বাবু। চালাঘর ত? বাইরে চ্যাটাই পাইত্তা বইসা রইছি, মাইয়ারা ঘরে, চোখ দুইডা ঘুমে ঢুইলা-ঢুইলা আইতেছে। একসময় দেখি লক্ষ্মীরে দুই হাতে লইয়া ছোডোবাবু আমার কাছে আসছে, বললেন—ঘুমাইয়া পড়ছে। শোয়াইয়া দাও।

লক্ষ্মী আমার কাছে শুইয়া পড়ল। একটুক্ষণ পরে দেখি, বাড়ির

যে বউডা, সে ঘর থেকে বাইর হইয়া আসছে। আইস্যা পাকঘরের দিকে গেল। তখন ভোর হইয়া আসছে, মুরগী ডাকতেছে। বাড়ির কর্তা আর ছোডোবাবুর জানাশোনা মানুষটি আসিয়া বসলেন আমার কাছে। আর, ছোডোবাবু—?

কিছুক্ষণ পরেই ঘরের ভিতরে মাইয়াডা চীৎকার কইরা উঠল। কিন্তু, করনের আছে কী? ঘরের দরজাটা ভিতর হইতে বন্ধ। ছোডোবাবুর দোস্ত আমাকে এক টান দিয়ে উঠনের উপরে চিৎ কইরা ফেইল্যা বুকের উপর বসেছে। বলছে—চীক্কৈর দিবে ত' একেবারে শ্যাষ কইরা ফেলাইমু!

অতোটুকু মাইয়া—লক্ষ্মী-হাপুস নয়নে কান্দতেছে, আর আমি, সরস্বতীর অক্ষম বুড়া বাপ মাটির উপরে পাথরের ভারে পিষা মরতেছি; মনে হইতেছে দম বন্ধ হইয়া এখখুনি মইরা যামু। কিন্তু যাই নাই বাবু, তবু, তবু বাইচা আছি। অজ্ঞান হইয়া গেছিলাম! মুখে-চোখে জল দিয়া জ্ঞান যখন ফিরাইয়া আনল, তখন, ছোডোবাবু ঘর থেকে বাইরইয়া আসতেছেন। কাছে আসিয়া বললেন—এই কথা যদি জানাজানি হয় তাইলে তোমারে কাইট্টা ফেলাইমু বুড়া!

বললেন—চুপচাপ থাকো। তোমার মাইয়ারে আমি নিকা করুম অনে।

আর কথা কই নাই বাবু। কয়ডা দিন সেইখানে থাইকা আইলাম ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া গফুরগাঁও। গফুরগাঁওয়ে রেলে উইঠ্যা আসলাম ময়মনসিংহ। ময়মনসিংহে ছোডোবাবু আমাগো যে-বাড়িতে রাখছিলেন, সে বাড়িতে নিজে ছিলেন না। রোজ রাইতে মাইডারে ধইরা লইয়া যাইত, আর সকাল বেলা ফিরাইয়া দিয়া যাইত। কী কমু বাবু, বাপ হইয়া মাইয়ার দিকে চাইবার পারি? অথচ, সহরে তখন যে কাণ্ড হইতেছে, বাইর হইবার উপায় নাই। তখন মনে হইত, প্রাণে যে বাঁচিয়া আছি, সে-ই ঢের! সেইখান থিক্যা আসলাম জামালপুর। এইখানেও সেই একই ব্যাপার। কমু কী বাবু, এইরকম কইরা পাঁচ-

পাঁচটা মাস আমরা কাটাইলাম জামালপুর শহরে। সেইখান থিক্যা বাহাদুরাবাদে আসিয়া ফেরী পার হইয়া আসলাম ফুলছড়ি। ফুলছড়ি থিক্যা বোনারপাড়া হইয়া—গাইবান্ধা। এইখান থিক্যা লালমণির-হাট স্টেশনে যখন আসলাম, তখন দেখি, ছোডোবাবু পালাইয়া গেছে। মাইয়ারে জিজ্ঞাসা করি' মাইয়া কান্দে। ধমক ধামক দিতে শাড়ীর আঁচল দেখাইয়া কয়—আর আইবে না, পঞ্চাশটা টাকা দিয়া গেছে।

টাকা! সব ভুইলা গেলাম টাকার কথায়। বললাম—দে আমারে দে।

টাকা কয়ডা দিলো আমার হাতে তুইল্যা। এই লালমণিরহাট থিক্যা কী ভাবে যে সরভোগে আস্‌ছিলাম, তা'তো আপনারে আগেই কইছি। বাবু, প্রায় পনেরোটা বছর ছিলাম সরভোগে। মাইয়াডা থান পইরা থাকত, লোকলজ্জা এড়াইবার জন্যেই কইতাম—মাইয়া বিধবা।

কোলে 'কানু' আইল। ছেইলার মুখ দেইখ্যা মা সব ভুলছিল। বড়ো হইয়া বাপের নাম শুধাইত। মাইয়া চোখের জল সামলাইয়া ছেইলার শ্লেটে লিখ্যা দিতো--ভগবানচন্দ্র নাথ। সেই থিক্যা কানু যে এত বড়োডি হইল, সে জানত, তার বাপের নাম—ভগবান, আর বাপ বাইচ্যা নাই!

এদিকে লক্ষ্মী বড়োডি হইয়া উঠতেছে, কানু কইত—মাসী ভাইবো না, পাশ কইরা চাকরী করব, তখন তোমাগো আর দুঃখ থাকবো না।

কিন্তু বাবু, দুঃখ যাগো কপালে চিরটাকালের জন্য লিখা আছে, তাগো দুঃখ খণ্ডাইব কে? এই এত বছর পরে, সরভোগেও সেই আমাগো বাজরার মতো গোলমাল দেখা দিলো। বিত্তান্ত সংক্ষেপেই কই বাবু। মানুষ ত সময়ে সবই ভুইল্যা যায়। সরস্বতীও সব ভুইল্যা গেছিল। কিন্তু, ভু[illegible]তারে দিবো ক্যান ভগবান? চৌদ্দ-পনেরো বছর পরে যা সে ভুইল্যা ছিল, তা-ই আসিয়া দেখা দিলো। কতো কি কথা কয়দিন ধইরা শুনতেছিলাম। বাঙালীগো আসাম

থিক্যা খেদাইয়া দিবার জন্য বাইর হইতে লোক আসতেছে। কথাটা গুজব হইতে পারে। লক্ষ্মী কিন্তু কইত—বাবা, চলো, এইবেলা পলাইয়া যাই।

হায়রে, কথাটা তখন যদি কানে নিতাম। হঠাৎ একদিন গুণ্ডারা আইস্যা পড়ল! এবার আমারই চোখের সামনে সব-কিছু হইল বাবু। আমারে টাইন্যা আইনা মারতে মারতে উঠানের গাছটার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্টে বাইন্ধা ফেলল। মুখখান যখন গামছা দিয়া বাইন্ধা ফেলতেছিল, তখন লণ্ঠনের আলো হইলেও দেখতে আমি ভুল করি নাই। দেখি, হেই আমাগো ছোডোবাবু। চিৎকার দিয়া যে উঠব, এমন সাধ্য নেই, মুখখান বাইন্ধা ফেলাইছে। ঘরের অন্য দরজাডা ভাইঙ্গা ফেলছে বুঝি? দেখি, সরস্বতীর তুইডা হাত ধইরা তুইজনে টানতে টানতে আনতেছে, আর সরস্বতী তাগো হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করতেছে, তাগো হাত কামড়াইতে চায়, তবু পারে না!

বাবু কি বলব, আমারই চোখের সামনে সরস্বতীরে ওরা মাটিতে শোয়াইয়া ফেলল। আর, সেই ছোডোবাবু—সে বোধ হয় রাত্রিবেলা সরস্বতীরে চিনতে পারে নাই। সরস্বতী কিন্তু ঠিক চিনতে পারছিল। না পারলে পরে, সে যা করল, তা কী করতে পারত?

লক্ষ্মী কোথায় গিয়ে লুকাইয়া ছিল জানি না, জানি না কানুই বা কোথায় গিয়া লুকাইয়া ছিল। মায়ের ঐ তুর্দশা দেইখ্যা ছেলে আর থির করতে পারে নাই! ছুইট্টা আইস্যা পড়ল একেবারে ছোডোবাবুর উপর। তারপরে, আর শুনবেন বাবু? লোহার ডাণ্ডা দিয়া বাপ ছেইলার মাথাটা একেবারে রক্তে ভাসাইয়া দিলো! 'মা' বইলা সেই যে রক্তমাখা কানু মাটি নিলো, আর উঠল না! উঠল সরস্বতী, মাথাটা তার খারাপ হইয়া গেছে ঐ দৃশ্য দেইখ্যা! হা-হা কইরা পাগলের মতো হাসতে লাগল সরস্বতী, কাপড়ের-চোপড়ের ঠিক নাই, ঘুইরা ঘুইরা সে নাচতেছে আর বল্‌তেছে—কেমন মজা। বাপ মারল ছেইলেরে নিজের হাতে!

সবই এই পোড়া চোখে স্থির হইয়া দেখতে ছিলাম বাবু। কথাটা শুইন্যা ছোডোবাবু চমকাইয়া ওঠলেন, সরস্বতীরে ধইরা জিজ্ঞেস করলেন—তুই কে। কে তুই ?

চীৎকার কইরা মাইয়া আমার বইলা উঠল—চিনতে পারো নাই। আমি সরস্বতী। কানু তোমারই ছেইলা। দুই হাতে রক্তে ভাইসা-যাওয়া মরা ছেলেডারে তুইল্যা নিয়া ছোডোবাবু সেই যে বার হইয়া গেলেন দলবল লইয়া, আর আসলেন না। মাথা ঘুইরা পইরা গিয়া সরস্বতী অজ্ঞান হইয়া গেছে। আমি এইভাবে পইরা আছি, সময় যেন আর কাটে না। ছেলেডা গেল, মাইয়াডাও মরল নাকি ?

খানিক পরে, পিছের জঙ্গল থিক্যা বাইর হইয়া আইল লক্ষ্মী, আইস্যা, আমার পনেরো বছরের ঐটুকু মাইয়াডা, আমার হাতে পায়ের বাঁধন খুইলা দিলো।

বাঁধন খুইল্যা দিলো বটে, কিন্তু হাতে পায়ের কী যে দোষ হইয়া গেল সেই থিক্যা বাবু, হাত-পা কেবল কাঁপে, কোন কাজ ঠিক মতো আর করতে পারি না।

যোগীন্দ্র চুপ করে রইল।

প্রশ্ন করলাম—তারপর—তারপর ? কী হলো সরস্বতীর ?

ধীর কণ্ঠে যোগীন্দ্র বলল—বাইচ্যা উঠল বাবু। মাথার গোলমাল, কানুর কথাটা পর্যন্ত মুখে আনতে পারে না। আমার তখন ভয় হইল লক্ষ্মীকে নিয়ে। যা হবার হইছে এখন এই মাইয়ার কিছু না হয়। ভয় পাইয়া সেই রাত্রেই আমরা হাঁটাপথে কোনরকমে চইলা আইলাম—বিজনী। সেইখান থিক্যা রেলে চড়লাম। কীভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যে মহাকালগুড়িতে আসলাম, সে বিত্তান্ত আর শুইন্যা কী করবেন ? সরভোগের এক ডাক্তারবাবুকে দেখলাম জোরাই স্টেশনে। তাঁরও মাথায় আর হাতে ব্যাণ্ডেজ। তিনি আমার কানুরে জানতেন, কানুর জ্বরটর হইলে তাঁর কাছেই লইয়া যাইতাম। বললেন—যোগীন্দ্র, বেঁচে আছো ?

তারপরেই আমার পিছনে সরস্বতীকে দেখতে পাইয়া চম্‌কাইয়া ওঠলেন। বললেন—কানুর মা, না? এ কী হয়েছে?

বললাম—মাথাটা খারাপ হইয়ে গেছে।

ডাক্তারবাবু দৃশ্যটা বোধহয় সহ্য করতে পারেন নাই। আমারে ইসারায় ডাইক্যা নিয়ে গেলেন প্লাটফর্মের অন্য দিকে, বললেন—একটি গুণ্ডামতন লোক তোমার কানুকে নিয়া আসছিল ডাক্তারখানায়। মাথাটা ফাঁক হইয়া গেছে, রক্তে ভাইস্যা গেছে, ছেলেও বাইচ্যা নাই, লোকটা তবু বলে—ওকে বাঁচাইয়া দাও ডাক্তার। কী কইরা বাঁচাবো? আমি কি ভগবান। বাঁচাতে পারলাম না বলে, এই দেখ আমার অবস্থা।

বলে, ডাক্তার বাবু মাথার আর হাতের ব্যাণ্ডেজ দেখালেন।

ডাক্তার বাবু ছেলে-বউরে নিয়া স্টেশনে বসিয়া আছেন, আমরা চইলা আইলাম স্টেশন ছাইড়া। হাতে পয়সা কড়ি নাই' যাবো কোথায়?

মহাকালগুড়িতে ঘুরতে ঘুরতে আইসা পড়লাম। জঙ্গল কাইট্টা খুপরীও করলাম। লক্ষ্মী শুধাইল বাঁ, যদি এইখান থেও তাড়াইয়া দেয়?

উত্তরটা দিতে পারি নাই বাবু। কেমন যে ডর লাইগা গেছে। যেখানেই যাই, সেখানেই তাড়ায়। তয় আমাগো ত্থাশ কোথায়?

চুপ করে রইলাম। ও বললে—না বাবু' আর ভাবি না। মনে মনে একটা বিচার কইরা নিছি। চা-বাগানের থিক্যা এক বাবু আসে, লক্ষ্মীরে তার চোখে লাগছে, নিয়া যাইতে চায়, নিয়া যাক্।

চম্‌কে উঠলাম যোগীন্দ্রর কথায়। বললাম—বল্‌ছ কী তুমি!

যোগীন্দ্র বললে—আর চিন্তাভাবনার শক্তি নাই বাবু, আর বিয়া করব কে? থাকুক তবু একজন ভালো লোকের কাছে। শান্তভাবে ও যে কতো বড়ো কঠিন কথা বলছে তা ও বোধ হয় জানে না। উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলাম—বাপ হয়ে একথা বলছ যোগীন্দ্র?

—হ্যাঁ বাবু।—যোগীন্দ্রর ধীর-শান্ত কণ্ঠস্বরে অসীম ক্লান্তি অনুভব করা যায়, বলল—আমাগো চিন্তাভাবনা সব ওলোট-পালট হইয়া গেছে। সরভোগে কী দেখলাম বাবু? বাপের সামনে মাইয়ার উপর, স্বামীর সামনে স্ত্রীর উপরে অকথ্য অত্যাচার করতেছে। সেই স্ত্রীরে ত ফিরাইয়া নিতাছে স্বামী, কী আর করব, বলেন!

বললাম—এখন ত সব শান্ত, তোমরা ফিরা যাও না?

যোগীন্দ্র যেন একটু অবাক হলো আমার কথায়, বললে—ফিরা যাইতে কন আপনে?

বললাম—আর না হয়ত, যে-সব রিলিফ ক্যাম্প হয়েছে—

তাড়াতাড়ি বলে উঠল যোগীন্দ্র—বিশ্বাস নাই বাবু, বিশ্বাস নাই। এই যে মহাকালগুড়িতে আছেন আপনি, কোন্‌দিন দেখবেন, কোথা থিক্যা কী হইব, আপনাগোও তাড়াইয়া দিছে, আমরা ত কোন ছার!

চুপ করে রইলাম। একটু পরে যোগীন্দ্র আবার বললে—তার থিক্যা চা-বাগানের সেই ছোকরা বাবুটিই ভালো, জাতে আপনের মতো উচ্চ না, আমাগো জাত না হইলেও আমাগো মতনই, মাসে-মাসে একশোটা কইরা টাকা দিবো কইতেছে, আমি ত কাজের বার হইয়া গেছি, কোন্‌দিন চক্ষু বুজব তারও ঠিক নাই, ওরা দুই বইনে বাইচ্চ্যা-বইচ্যা থাকুক, তাহলেই হইল।

সারাটা রাত চুপচাপ ওদেরই কথা ভেবেছি। ওরা আসবার আগে পর্যন্ত মহাকাশ জুড়ে যে সব অগণিত নেবুলা বা ছায়াপথ রয়েছে, তাদের যে-কটির কথা জানতে পেরেছে মানুষ, সেই সব নেবুলা, অ্যাণ্ড্রোমিডা থেকে শুরু করে ‘ইউনিকর্ণ’ ও ‘ওরিয়ন’-তারকাচক্রের নেবুলার কথাগুলি দুর্দান্ত কৌতূহল নিয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম। আর, আজ দেখছি, ওরা আসা থেকে অবধি, যেখানকার বই সেখানেই পড়ে আছে একটি পৃষ্ঠাও আর ওল্‌টানো হয়নি! মহাকাশ-তত্ত্বের

বইখানা টেবিলের সামনেকার তাকে নানান্ বইয়ের মধ্যে থেকে সোনার জলে লেখা নামটি নিয়ে ঝলমল করছে, কিন্তু তবু আমাকে তা' টানতে পারল না। যোগীন্দ্র আর তার দুই কন্যার কথা যেন আমাকে মহাকাশ থেকে জোর ক'রে কঠিন মাটির ওপরে টেনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। কাগজে পড়েছি, দূর থেকে দেখেছি, কিন্তু আমার দেশ আর সমাজ যেন হঠাৎ তার সমস্ত সূক্ষ্ম আবরণ সরিয়ে ফেলে একেবারে আমার ঘরের মধ্যে এসে অনুপ্রবেশ করেছে!

অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঘুম আসেনি। সে রাত্রে, শুধু ওদেরই কথা ভেবেছি। বিশেষ করে সরস্বতী যেন নূতন এক চেহারা নিয়ে আমার সামনে এসে আবির্ভূত হয়েছে! একটা মানুষের জীবনে যে এত-খানি মর্মান্তিক কাহিনী লুকিয়ে থাকতে পারে, এ প্রত্যক্ষ না জানতে পারলে বিশ্বাস করা কঠিন! ওর মুখের সেই বিচিত্র হাসি আর সেই অস্ফুট কয়েকটি কথা,—, 'আসো না?'—আসো?—যেন আমার মনে তীব্র কশাঘাত হানতে লাগল! যোগীন্দ্র বলেছিল—আমার মেয়ে কী চায় আমি জানি না? আমি যে ওর জন্মদাতা পিতা!

কিন্তু কী ও চায় যোগীন্দ্র ত আমাকে এত কথার পরেও স্পষ্ট ক'রে বলেনি। কিম্বা স্পষ্ট ক'রে বলাও যায় না! উন্মাদ যে কখন কী চায়, তার হিসাব করাও কি সহজ?

পরদিন এক সময় যোগীন্দ্রকে বললাম—ওর চিকিৎসা করাও না কেন? কতো সব উন্মাদ আশ্রম রয়েছে। পাঠাবে? বলো, চিঠি-লেখালেখি শুরু করি।

দুটি চোখে আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠল যোগীন্দ্রর, বললে—না বাবু ও পাগল আছে ওই আমার ভালো। ওরে ছাইরা থাকতে পারুম না।

আর কথা হয়নি। আমারও দৈনন্দিন কাজ আছে। অফিসের সে কাজ ত আর ফেলে রাখা যায় না? বাধ্য হয়ে সাইকেল নিয়ে

যথারীতি বেরিয়ে পড়তে হয়। যেটুকু বাড়িতে থাকি, ওদের তিনজনকে লক্ষ্য না করে পারি না। বারান্দা থেকে ভিজে শাড়ী ঝুলছে, সাইকেল করে যখন শ্রান্ত হয়ে ফিরে আসি, তখন তা দেখতে বেশ লাগে। ওরা কথাবার্তা বলে খুব কম, যে যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে; তবু মাঝে মাঝে লক্ষ্মীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, চার দেয়াল ঘেরা আমার ঘরটির অন্তরালে ব'সে সেই স্বর শুনি, আর মনটা কেমন যেন উদাস হয়ে যায়। নীচে, ঘেরা কলতলায় বসে যখন লক্ষ্মী কাপড়-চোপড় কাচে, তখন ওর হাতের কাচের চুড়িতে অদ্ভুত একটা ঝংকার ওঠে, ওকে দেখতে পাই না বটে, কিন্তু চুড়ির ঝংকার এক আশ্চর্য সঙ্গীত হ'য়ে কানে এসে বাজে।

নিছক্ কাব্য করার বয়স আর নেই। হয়ত দশ বছর আগে ওরা কেউ এলে মনে আরও মধুরতা অনুভব করতাম, তবু অস্বীকার করতে পারি না, এক অলক্ষ্য সেবা এসে আমার স্বাচ্ছন্দ্যকে দিনরাত ছুঁয়ে যাচ্ছে।

দিন সাত-আট বোধহয় কেটে গেছে, ওদের শাড়ী-টাড়ি আরও কিছু এনে দিয়েছি, সরস্বতীকে বাইরে বড়ো একটা দেখতে পাই না, লক্ষ্মীকে দেখি, শাড়ী জামা পরে মাথার চুল বেঁধে গৃহ কাজ করে বেড়াচ্ছে, হঠাৎ চোখ পড়লে ভালোই লাগে।

বাহাদুরের চিঠি এসেছে, বিয়ে তার পিছিয়ে গেছে, তার ফিরে আসতে মাস খানেকের কম নয়। প'ড়ে একটু আশ্বস্ত হলাম, যোগীন্দ্রকেও বললাম কথাটা। সে বললে—ঠিক আছে বাবু, সে আইলে আমরা চইলা যামুনে।

না যোগীন্দ্র, সে কথা বলিনি—বললাম—তারা স্বামী স্ত্রী এসে, যাবে আলাদা চালায়। তোমরা যেমন আছো তেমনি থাকবে। ও ঘর আমি তোমাদেরি থাকতে দিয়েছি। জানো ত আমার কোম্পানী এ জমিটা লীজ নিয়েছে বাড়ি শুদ্ধ, অনেক দিনের লীজ।

'লীজ' কথাটা ঠিক বুঝল কি না জানি না, মুখের দিকে নির্বাক হয়ে বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

কয়েকটা দিন কেটে গেল। ওরা খানিকটা সহজও হয়ে এসেছে চলাফেরায়। আমাকে দেখলে আর সেই রকম জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে না।

একদিন, কী একটা ব্যাপারে রান্নাঘরের দিকে গেছি, দেখি লক্ষ্মীর পাশে বসে সরস্বতী। বঁটিতে তরকারী কুটছে। আমার পক্ষে অবাক হবারই কথা। কারণ এর আগে সরস্বতীকে কখনো ওপরে দেখিনি। দ্বিতীয়তঃ, সে যে স্থির মনে বসে কাজ করছে, এ দৃশ্যও কম বিস্ময়ের সৃষ্টি করে না।

সময়টা ছিল সকালের দিকে। আকাশ মেঘলা মেঘলা থাকায় বেশ শীত শীত লাগছে, কাছেই কোনো গাছে কী একটা পাখী ডেকে ডেকে সারা হচ্ছে।

তেমনি চোখ ঘুরিয়ে আমাকে দেখল সরস্বতী, আর আশ্চর্য, ঠিক তেমনি বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটের কোণে।

লক্ষ্মী সেটা লক্ষ্য করে প্রায় ধমকই দিয়ে উঠল ওর দিদিকে, বলল—এই দিদি, ওদিকে কি দেখিস। আলুগুলা কুইট্টা ফেলা।

সরস্বতী অমনি মুখ ফিরিয়ে তার কাজে মন দিলো। আমি লক্ষ্মীকে বললাম—তোমার সঙ্গে একটু কথা ছিল লক্ষ্মী, আসতে পারবে?

—আস্ছি।

আমি ঘরে বসবার পর মুহূর্তেই ও এসে ঘরে ঢুকল আঁচলে হাত মুছতে মুছতে। যেমন সম্ভ্রমের সুরে ও কথা বলে, তেমনি সুরে ও বললে—কী বাবু?

বললাম—আমার চাবির গোছাটা তুমি আঁচলে বাঁধো দেখি। বারবার চাবি হারাচ্ছে, কোথায় রাখি—কি করি খুঁজে পাই না। তুমি রাখো। টাকা-পয়সা যখন যা দরকার নিয়ে নিও। কেমন?

কথাটায় কেমন যেন ভয় পেলো লক্ষ্মী, বললে—আমি যে হিসাব জানি না!

—জানতে হবে না হিসাব—বলে উঠলাম—বেশী টাকাকড়ি আমি বাড়িতে রাখি না। রোজকার বাজার খরচ-টরচ, এই সবের কথা বলছি। তোমার বাবাকে বার করে দেবে। কেমন? এই নাও চাবি!

দ্বিধাগ্রস্ত পায়ে টেবিলের কাছে এসে চাবিটা তুলে নিয়ে আঁচলে বাঁধছে, এই সময় ঘরে এসে ঢুকল সরস্বতী। সে একবার তাকালো লক্ষ্মীর দিকে, একবার আমার দিকে, তারপরে আবার তেমনি করে হাসল।

নির্বাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছি দুজনে, হঠাৎ এক সময় লক্ষ্মী যেন সম্বিৎ ফিরে পেলো, ডেকে উঠল—দিদি? করছিস কি? এখানে আইছিস্ ক্যান?

পাগল মেয়েটা করল কী, হঠাৎ ধপ্ করে মেঝের ওপরে বসে পড়ল। বসে, হাত বাড়িয়ে লক্ষ্মীর হাঁটু ধ'রে ঠেলতে লাগল, বলতে লাগল—যা-যা, তুই যা।

লক্ষ্মী বোধহয় ওর হাত ধ'রে ওকে টেনে ওঠাতে যাচ্ছিল, আমি ইঙ্গিতে ওকে ছেড়ে দিতে বললাম—আচ্ছা যাও না, দেখি ও কী করে?

লক্ষ্মী পায়ে পায়ে দরজার কাছ পর্যন্ত গেল, কিন্তু ঘর থেকে একেবারে বেরিয়ে গেল না। সরস্বতা বড়ো-বড়ো চোখদুটি তুলে আমার দিকে তাকালো। নির্ভয়-নিঃসংকোচ সেই দৃষ্টি। তেমনি তাকিয়ে থাকতে এক সময় বলে উঠল—আমার বিয়া হয় নাই। আমারে বিয়া করবা?

বলে উঠলাম—করব।

সঙ্গে সঙ্গে সে যেন নিশ্চিত বোধ করল, মাথা হেলিয়ে বলল—আচ্ছা।

তারপরেই, উঠে চলে গেল বাইরে। লক্ষ্মী যে কবাটের কাছে

দাঁড়িয়ে আছে, সেটা সে যেন একেবারেই লক্ষ্যই করল না। উঠে দাঁড়ালাম, বললাম—দেখ দেখি, কোথায় যায়?

লক্ষ্মী বাইরের দিকে তাকিয়ে দিদিকেই বুঝি লক্ষ্য করছিল, বললে—রান্নাঘরের দিকে গেল।

তারপরে, ঘরের ভিতরে দু'পা এগিয়ে এসে লক্ষ্মী বললে—দিদির এমন শান্ত ভাব আমি আগে দেখি নাই বাবু।

এবং, শুধু লক্ষ্মী কেন, যোগীন্দ্র এসে পর্যন্ত অবাক হয়ে গেল সরস্বতীকে দেখে। এমন কি ঘরদোরের কিছু-কিছু কাজ পর্যন্ত করতে লাগল সে। দেখে কে বলবে, এ-মেয়ে পাগল? শুধু, আমাকে দেখামাত্র মাথায় কাপড়টা তুলে দেয়। আমার ঘরে যে খুব আসে তা নয়, আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়, এমন নয়—নিজের মনেই সে আছে, শুধু আমাকে দেখলে মাথায় দেবে ঘোমটা আর কখনো-সখনো চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে-টিপে হাসে।

এই ভাবেই দিন যায়। ওদের তিনজনের জন্য আমার খরচ যে খুব বেড়ে গেছে, তা' কিন্তু নয়। বরং বাহাদুর মাসে-মাসে যে-খরচ দেখাতো, তার মধ্যেই সব কুলিয়ে যেতে লাগল। যোগীন্দ্র একটি খাতা কিনেছে, মেয়ের কাছ থেকে শুনে শুনে হিসাব লেখে। ঘর থেকে মাঝে মাঝে শুনতে পাই, বারান্দায় বসে বাপ-মেয়েতে হিসাব করছে!

—বাঁ, বাবুর বাক্স থিক্যা তিন টাকা নিছি।

—হিসাব দে।

বাজার করছ কতো? দেড় টাকা? ধোপায় আইছিল, দিছি একটাকা দুই আনা। ছ-আনা আমার আঁচলে বান্ধা আছে। ঠিক আছে না তিন টাকার হিসাব?

—আছে।

সেই খাতা সন্ধ্যার পর আমার টেবিলে শোভা পায়। আমি

কৌতূহলের বশেই দু-একদিন দেখেছি, আর দেখি না, যেমন খাতা তেমনি পড়ে থাকে।

মনটা অদ্ভুত এক প্রসন্নতায় ভরে আছে আমার। এই যে দীর্ঘ জীবন কাটিয়ে এলাম, ঠিক এ ধরণের প্রসন্নতা ইতিপূর্বে অনুভব করেছি বলে মনে পড়ে না। একটা বিধ্বস্ত পরিবারে—আর যাই হোক—কিছুটা শান্তি যে আনতে পেরেছি, এ আত্মতৃপ্তি কি কম?

সন্ধ্যাবেলা, কাজকর্মের পর, আবার আমার পাঠ শুরু করেছি, নক্ষত্রলোকের বিবরণের মধ্য দিয়ে বহুদিন পরে আবার মনে পড়ে যায় অতসীর কথা। মনে পড়ে, আর মনটা উদাস হয়ে যায়।

লক্ষ্মী আসে চায়ের কাপ নিয়ে। আসে, হয়ত বা দুটো-একটা কথা বলে, আবার চলে যায়। সেদিনও এসে চা রেখে নীরবেই চলে যাচ্ছিল, পিছন থেকে ডেকে উঠলাম—লক্ষ্মী, যেও না, শোনো।

দাঁড়ালো। ফিরলো আমার দিকে। তারপরে, তাড়াতাড়ি বলে উঠল—আসছি। ভাতটা চড়াইয়া দিয়া আসছি।

চলে গেল, এবং এলো একটু পরেই। প্রায় একমাস ওরা এখানে আছে, আজ টেবিল-ল্যাম্পের স্বল্পালোকে ওকে দেখে মনে হলো, চেহারাটা ওর খানিকটা ভালো হয়েছে।

বললাম—বাহাদুরের চিঠি এসেছে। তোমার বাবা কোথায়?

—নীচে! ডাকব?

—না। তুমিই শুনে রাখো। বাহাদুর তার নতুন বৌকে নিয়ে আসছে।

চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। তারপরে বলল—কবে আমাগো চলে যাইতে কন?

বললাম—সেই কথাই বলছি। চলে যেতে হবে না। তুমি যেমন আছো তেমনি থাকতে পারবে না? বাহাদুর বাইরের কাজগুলো করবে।

মুখ তুলল, বলল—দিদি আর বাবা?

—তারাও থাকবে।

হঠাৎই আর্তস্বরে বলে উঠল লক্ষ্মী,—এতো লোকের ঝক্কি আপনে পোয়াতে চান ক্যান? আপনে যে খরচান্ত হইয়া পড়বেন। দ্যাশে আপনার কেউ নাই?

—না।

লক্ষ্মী চুপ করে রইল।

কয়েক মুহূর্ত নীরবতার মধ্যে দিয়ে কেটে গেল। বললাম—চা বাগানে নিয়ে যেতে চায় যে লোকটি, সে কে?

মুখ তুলল। কোনো ভাবান্তর লক্ষ্য করলাম না সে মুখে। বললে—চা-বাগানে চাকরী করে।

—তাকে দেখেছ?

—হ্যাঁ। কয়েকবার ত আসছে এখানে।

—এখানে? মানে, এই বাড়িতে?

—না, আমাগো খুপরীতে।

—কী রকম দেখতে?

লক্ষ্মী মুখ নীচু করে রইল সম্ভবতঃ সঙ্কোচ অনুভব করেই।

বললাম—এসব কথা তোমার বাবার সঙ্গেই হওয়া উচিত, তবু তোমাকে বলছি ইচ্ছা করে। জীবনটা যে কী, তাত জেনেছে! অযথা লজ্জা বা সংকোচ করে জীবনে আর কোনো জটিলতা ডেকে এনো না।

কথাটা কতখানি বুঝল জানি না, বললাম—শুনেছি, বয়সে ছোকরা। তার মানে, বয়সের দিক দিয়ে তোমার সঙ্গে মানিয়েই যাবে। কিন্তু, আমার কথা হচ্ছে, সে বিয়ে করবে না কেন?

কোনো সাড়া নেই। ভালো করে তাকিয়ে দেখি, দুটি চোখ অকস্মাৎ ভরে এসেছে জলে! এই বোধ হয় প্রথম লক্ষ্মীর চোখে দেখলাম—জল।

কিন্তু, মুহূর্তমাত্র। পরক্ষণেই চোখের জল মুছে সে নিজেকে

সামলে নিলো। বললে—কাপটা দেন বাবু, চা বোধ হয় ঠাণ্ডা হইয়া গেছে।

বলে, আমার অপেক্ষা না করে নিজেই কাপটা নিয়ে ত্বরিত পায়ে বেরিয়ে গেল বটে, কিন্তু আমাকে আবার আচ্ছন্ন করে গেল একরাশ চিন্তার কুয়াশায়।

কী-যে ভাবছিলাম, নিজেরই জ্ঞান নেই, হঠাৎ মনে হলো ধীর পায়ে লক্ষ্মী এসে টেবিলের কাছে দাঁড়িয়েছে। চমকে মুখখানা তুলতেই অবাক হয়ে গেলাম, দেখি, লক্ষ্মী নয়, নীলাম্বরী শাড়ীখানা পরে অশরীরী কোনো সত্ত্বার মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে,—সরস্বতী।

শুধু যে চমকে উঠলাম, তা নয়, কেমন যেন অদ্ভুত একটা ভয়ও হোল। প্রথম-প্রথম মাথার চুল থাকত দেখতাম জট পাকানো, রুক্ষ। ছুদিন ধরে চুলে দেখছি যত্নের ছাপ। লক্ষ্মী বোধ হয় ধরে বেঁধে চুল আঁচড়ে খোঁপা করে দিয়েছে! বললাম— কী সরস্বতী?

ঠোঁটের কোণে তেমনি মৃহু হাসি, ধীরে ধীরে কথাও বলল। বলল—কানুরে শহরে পাঠাইছি?

পাগলের উক্তি শুনে ভিতরে যেন একটা হিমস্রোত প্রবাহিত হয়ে গেল। কোনক্রমে বলে উঠলাম—হ্যাঁ।

—পড়তে?

—হ্যাঁ।

অদ্ভুত একটা তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল পাগলিনীর ঠোঁটের কোণে, আরামে চোখ ছুটি যেন বুজে এলো। টেবিলের কাছ থেকে সরে গেল আমার বিছানার কাছে। লক্ষ্মী সন্ধ্যার পরই সাধারণতঃ এসে বিছানা-টিছানা পেতে দিয়ে যায়, আজ বোধ হয় এখনো অবসর পায় নি। সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম, আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে সরস্বতী বিছানা পেতে ফেলল, যেখানে যেটি রাখবার সেটি রাখতে ভুল করল না।

কাজ শেষ হলে, আমার দিকে তাকালো, ঠোঁটের কোণে তেমনি মৃদু হাসি। বললে—খাওয়া-দাওয়ার পর শুইয়া পইরো, কেমন?

মাথা কাত করে জানালাম—আচ্ছা।

—রাত জাইগো না?

—না।

সরস্বতী দরজার দিকে এগিয়ে গিয়েও থম্‌কে দাঁড়ালো, সেই বিচিত্র হাসিটুকু ঠোঁটের কোণে ফুটিয়ে তুলে তাকালো আমার দিকে, তারপর ধীরে পায়ে সরে এলো কাছে। খুব কাছে অবশ্য নয়। আমি বিস্মিতে ওর কার্যকলাপ লক্ষ্য করছি, ও করল কী, হঠাৎ সরে গেল বিছানার কাছে। গিয়ে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে আবার তাকালো, বললে—শুই?

মাথা হেলিয়ে উত্তর দিলাম—আচ্ছা।

কোনো দ্বিধা নয়, নিঃসংকোচে আমার বালিশে মাথা রেখে নরম তোশকের বিছানায় তনুদেহখানি এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল সরস্বতী।

অবাক হয়ে কিছুক্ষণ ধরে ঘটনাটার নূতনত্ব অনুভব করতে লাগলাম। নীলাম্বরী শাড়ী পরা গৌরবর্ণা যুবতী মেয়েটি বিছানায় শুয়ে আছে, আমি চেয়ারখানা সরিয়ে নিয়ে সেইদিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম বহুক্ষণ। জানালার বাইরে বিচ্ছুরিত জ্যোৎস্না অপূর্ব মায়াজাল বিস্তার করেছে। ঘরের আলোটা কমিয়ে দিয়ে, সেই আলো আর এই নারী—উভয় সৌন্দর্যের মধ্যে যে যোগসাধন হয়ে গেল, সেই আশ্চর্য শোভার দিকেই আমার অভিভূত দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে রইল।

নিজের অজ্ঞাতেই কখন যে ধীর পায়ে বিছানার কাছে এসে ওর শিয়রে দাঁড়িয়ে পড়েছি, খেয়াল নেই। হঠাৎ চমক ভাঙতেই লক্ষ্য করে দেখি, সরস্বতী ঘুমিয়ে পড়েছে।

জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে ওর কপালে, ঠোঁটে, চিবুকে, কণ্ঠে, বক্ষোদেশে খেলা করছে। ঠাণ্ডা একটু বাতাস এসে কাঁপিয়ে দিচ্ছে ওর চূর্ণালক, ওর শাড়ীর প্রান্ত।

মনে হলো, কাছে বসে ওর কপালের প্রান্তে ধীরে ধীরে হাতখানি বুলিয়ে দেই! অদ্ভুত এক মমতা অনুভব করতে লাগলাম সেই মুহূর্তে। পায়ের কাছে কম্বলটা ছিল পাট-করা, সেটি তুলে আলগোছে ওর গায়ের ওপর মেলে দিলাম!

আমি সু-চরিত্রের মানুষ নই, সেকথা আগেই বলেছি। ইভান্স আমার সেই সব উচ্ছৃঙ্খলতার সাক্ষী। বিবাহিত না হলেও নারী-দেহের স্বাদ আমার কাছে নূতন নয়! কিন্তু অবাক হয়ে গেলাম নিজেরই আচরণ দেখে! চেয়ারে ফিরে এসে, যতোই ওকে দেখছি ততই চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসতে লাগল, মনে হলো আমার, আমার সেই হারানো বোন—আমার সেই অতসীই বুঝি এসে শুয়ে আছে তার দাদার বিছানায়!

কতোদিন ত হয়েছে এই রকম! অতসী চোখের জল মুছতে মুছতে এসে ঢুকেছে, জিজ্ঞাসা করেছি—কীরে, কী হয়েছে? ধরা গলায় উত্তর দিয়েছে—মা বকেছে।

আর তারপরে, আমার বিছানায় শুয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে কে জানে! শেষ পর্যন্ত মা এসে করেছে ডাকাডাকি,—ওঠ—ওঠ—রাত্তির হয়ে গেল খেয়াল আছে? খাবি-দাবি না?

ঝড়ের মতো ঘরে এসে ঢুকল লক্ষ্মী, রুদ্ধকণ্ঠে বলল—বাবু, দিদিরে দেখছেন? দিদি নাই।

কথা না বলে হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলাম ওর দিদিকে। আর সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের আলোটার শিখাও দিলাম উজ্জ্বল করে!

বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল দুটি চোখ, বললে—এইখানে! আর আমি সারা বাড়ি খুঁজতাছি!

বললাম—ঘুমিয়ে পড়েছে!

লক্ষ্মী চোখ তুলে আমার দিকে একবার তাকালো তারপর বলল—আপনে মনে কিছু করবেন না, ওর ত মাথার ঠিক নাই, আইস্যা আপনার বিছানায় শুইয়া পড়ছে। আমি চাদর বালিশ বদ্‌লাইয়া দিমুনে।

একটু হেসে বললাম—না-না, সে'সব কিছু করতে হবে না। আসল কথা, ও কি রকম শান্ত হয়ে গেছে লক্ষ্য করেছ?

চোখ দুটি ছলছল করে এলো, বললে—আপনে ওরে যাদুকরছেন।

এবং বলেই আর দাঁড়ালো না, দ্রুত পায়ে ছুটে চলে গেল বাইরে।

কথাটা মনে মনে পর্যালোচনা করতে লাগলাম। মনে হলো, তাই বা মন্দ কী? ওর মতো মেয়েকে যদি আবার সুস্থ করে তুলতে পারি, তা সে যে কোনো উপায়ই হোক, তাতে কার বা কাদের লাভ-ক্ষতি হবে জানি না, কিন্তু আমার দিক থেকে এক বিস্ময়কর ঐশ্বর্য লাভ হবে। এই এতদিনের উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের যে গ্লানিবোধ মাঝে মাঝে মনটাকে নিপীড়িত করে, সেই বিক্ষোভের বহ্নিশিখা ত নির্বাণলাভ করবে! সে কি আমার পক্ষে কম লাভ?

মেয়ে বোধহয় নীচে গিয়ে বাপকে কিছু বলে থাকবে, খানিকক্ষণ পরেই যোগীন্দ্র এসে ঘরে ঢুকল। বললাম—এসো যোগীন্দ্র। তোমাকেই খুঁজছিলাম মনে মনে।

—কন্ বাবু।

বললাম—দেখছ বিছানায় কে শুয়ে আছে।

নিরুৎসুক চোখ মেলে এবার তাকালো সেদিকে যেগীন্দ্র। বললাম—বোসে। কথা আছে।

মেঝের ওপরে যেমন করে এসে বসে, তেমনি করে বসে পড়ল যোগীন্দ্র। বললাম—তোমার মেয়ে সেরে গেছে বলে মনে হয়, না?

মাথা নীচু করে কী যেন ভাবতে লাগল যোগীন্দ্র, তারপর ব'লে উঠল—অনেক ঠাণ্ডা হইয়া গেছে।

—কেন বলো ত?

যোগীন্দ্র বললে—লক্ষ্মী কয়, আপনের জন্যে। লক্ষ্মী কয়, আপনে দেবতা।

অল্প একটু হেসে উঠলাম, বললাম—না যোগীন্দ্র, আমি রক্ত মাংসের মানুষ। যা সবাই চায়, আমিও তাই চাই।

তুমি এখানকার মানুষজনের সঙ্গে কতোটা মিশেছ জানি না, আমার এ অঞ্চলে খুব সুনাম নেই। বাহাদুর আসছে, সে এলে কথা কয়ে আরও বুঝতে পারবে। আমি আজ সোজাসুজি তোমাকে একটা কথা বলব। লক্ষ্মীকে তুমি বাপ হয়ে চা বাগানে দিতে চেয়েছিলে, সেই জন্যই সাহসী হয়ে বলছি, সরস্বতীকে তুমি আমার হাতে দিতে পারো? ও আমার কাছে থাকবে, আমার ঘরে-দোরে। ওর আমি চিকিৎসার ব্যবস্থা করে ভাল করে তুলব।

প্রস্তাবটা এত বিস্ময়কর মনে হলো যোগীন্দ্রের কাছে যে, সে একেবারে উঠে দাঁড়ালো। বিস্ফারিত দুটি চোখ মেলে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো আমার কাছে, বলল—এ আপনি কী বলছেন! আপনেও কী ক্ষেইপা গেলেন? ওর চিকীৎসা কইরা ওকে ভালো করে তুললে ও যখন কইব, আমার কানু কই? আমি চৌদ্দ বছর বিধবার থান পইরাই বা কাটইলাম ক্যান? তখন আমিই বা কী উত্তর দিমু, আপনেই বা কী উত্তর দিবেন। তরে থিক্যা ও যেমুন আছে তেমনি থাকুক, আমাগো পাগল মাইয়া, আমরা ঠিক সাম্‌লাইয়া রাখুম। আপনের দুইদিন ভালো লাগতাছে, তিনদিনের দিন কী আর ভালো লাগব? পাগল মাইন্‌ষেরে লইয়া নেশা কয়দিন টেঁকে?

একটু অবাক হয়েই শুনছিলাম যোগীন্দ্রর কথা। ও একটু দম নিয়ে আবার বললে—তার থিক্যা বাবু আপনেরে একটা কথা কই, লক্ষ্মীর ইচ্ছা না যে, সে চা-বাগানে যায়। আপনে অরে রাখেন না ক্যান?

নিদারুণ চমকে উঠলাম কথাটায়। বললাম—বল্‌ছ কী তুমি!

বললে—সরস্বতী অর গায়ে আঁচটুকুও লাগতে দেয় নাই বাবু। সরস্বতী বিপদের মুখে ঝাঁপ দিয়া পড়ছে, বইনেরে রাখছে আগলাইয়া। সরভোগে গুণ্ডারা যখন আইল, তখন পাছে লক্ষ্মীরে টাইন্যা লয়, তাই নিজে গেছে আগাইয়া, বুঝলেন?

একটুক্ষণ থেমে থেকে আবার বললে—মাথা খারাপ হইয়া গেছে,

তবু সেই অভ্যাসটা যায় নাই। পাছে বইনের দিকে আপনের চক্ষু যায় তাই নিজে আইছে আপনের সামনে আগাইয়া। আমি ওর জন্মদাতা, আমি কি জানি না বাবু, ও কী চায়?

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম কথাটা শুনে। কিছুক্ষণ পর্যন্ত কোনো কথাই পারলাম না বলতে। যোগীন্দ্রও চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবছিল।

বললাম—তাই যদি হয়, অর্থাৎ লক্ষ্মীকে যদি আমার দৃষ্টি থেকে বাঁচাতেই চাও, ত এ-অদ্ভুত প্রস্তাব তুমি করছ কী ভাবে?

তাড়াতাড়ি বলে উঠল যোগীন্দ্র—বাবু আমারে ভুল বুঝবেন না। পাগল মাইয়া আমার কী যে চায়, সেইটাই বললাম। আমার কথা হইতেছে স্বতন্ত্র। বাবু, দ্যাশ গেল, জাত গেল, এখনও ভাইস্যা বেড়াই। কার উপরে বিশ্বাস রাখুম কন? দ্যাশ থাইক্যা সরভোগ আইলাম, পাছে মাইন্‌ষে কিছু কয়, তাই মাইয়াডারে থান পরাইয়া রাখছি চৌদ্দ বছর। আজ সেই কথাটা ভাবি, আর বুকের মইধ্যে যেন ঢেঁকির পাড়টা ভাঙতে থাকে! ক্যান তখন সত্য কথাটা কইবার সাহস হয় নাই? আজ সাহস হয় বাবু। আপনে লক্ষ্মীরে রাখেন বাবু, আমি মনরে প্রবোধ দিমু, মাইয়ারে বিয়া দিছি। না, তাই বা ক্যান? বিয়া আবার কী? অর বিয়া হবে কেমন কইরা? বইনে ঐরকম, বাপটা ভিখারী, বিয়ার আশা করি কী কইরা?

ওর কথাগুলি শুনতে শুনতে হঠাৎ এক বিতৃষ্ণায় ভরে গেল মন। মনে হলো, একটা সুসম ছন্দে ট্রেনখানা চলতে চলতে হঠাৎ উল্টে পড়ে গেল, বহু মানুষের আর্ত চীৎকারে যেন দিকদিগন্ত ভরে গেল মুহূর্তে।

চেয়ারটা ঠেলে উঠে দাঁড়ালাম, বললাম—যোগীন্দ্র, তুমি মেয়েকে চা-বাগানেই নিয়ে যাও। আমি আর জড়াতে চাই না।

বাহাদুরের বউটি চৌদ্দ-পনেরো বছরের একটি ভীরু বালিকা বললেই হয়। কাছে এসে দুজনে প্রণাম করে দাঁড়াতেই, মনটা অদ্ভুত

এক প্রসন্নতায় ভরে উঠল। বাহাদুরকে বললাম—বউ ত সুন্দর হয়েছে রে!

বাহাদুর বললে—আসতে চায় না পাহাড় ছেড়ে। কিন্তু, আমি কি পাহাড়ে পড়ে থাকতে পারি বাবু? আপনার না জানি কতো কষ্ট হচ্ছে!

বললাম—কোনো কষ্ট হয় নি।

নিম্নকণ্ঠে বাহাদুর বললে—তিনটি মানুষ খাচ্ছে আপনার ওপরে। খুব খরচা হয়েছে ত আপনার?

বললাম—মোটেই না। যা হতো তা-ই হচ্ছে, বরং কিছু কমেতেই চলে যাচ্ছে।

বাহাদুরের মুখখানা কালো হয়ে উঠল।

বললাম—নীচের ঘরে জিনিষপত্র রেখেছিস ত? ঘরামি ডেকে নিয়ে আয়, আমি টাকা দিচ্ছি, চালা উঠিয়ে নিতে দুদিন কি তিনদিনের বেশি লাগবে না। এ তিনদিন ওরা ওপরেই এসে থাকবে না হয়।

তখনকার মতো বউকে নিয়ে বাহাদুর নীচে নেমে গেল বটে, কিন্তু যতো সহজে ব্যাপারটা মিটে যাবে ভেবেছিলাম, তত সহজে মিটল না। বাজারের দিকে বাহাদুরের জনকয়েক দেশোয়ালী ভাই থাকে একটা বাসা ভাড়া নিয়ে, সেই তাদের কাছে চলে গেল বাহাদুর তার বউকে নিয়ে। বললে—চালা উঠুক, তখন বউকে আনব। দুদিন থাক না ওখানে।

যোগীন্দ্র বললে—এটা কী হলো বাবু! বাহাদুরই ত থাকব, আমাগোই ত চইলা যাইবার কথা।

—কেন? চলে যাবে কেন?

যোগীন্দ্র বলেল—আমি ত চিঠি লিখ্যা দিছি চা-বাগানের বাবুরে, সে আইলে আমরা তিনজনেই চইলা যামু। আইস্যা পড়ব, দিন দুই তিনের মধ্যেই আইস্যা পড়ব। তার সঙ্গে এই রকমই কথা আছিলো।

বুকের ভিতরটা যেন কেঁপে উঠল এ কথায়—বললাম,—এর মধ্যে চিঠি লেখা হয়ে গেছে ?

হ্যাঁ। আপনে যে কইলেন।

কী যে হলো আমার মধ্যে, ক্রোধে দিগ্বিদিক শূন্য হওয়া বোধ হয় একেই বলে। তীব্র কণ্ঠে বলে উঠলাম—বাপ হয়ে এ ব্যবস্থা করতে তোমার লজ্জা হলো না ! মাসে মাসে একশো টাকা ? এমন করে টাকা রোজগার করতে লজ্জা করে না তোমার !

বিস্মিত হয়েই যোগীন্দ্র বললে আমার রোজগার ক্যান হইব বাবু ! মাইয়াডার রোজগার। তার একটা ভবিষ্যৎ নাই ? আমি থাকুম পাগলরে লইয়া, বাঁশ কাইট্টা দরমা বানামু, শরীরটা একটু সারাইয়া লই, আমাগো দুইটা পেট—দরমা বিক্রী কইরা—ঝুড়ি বানাইয়া ঠিক চইলা যাইব !

বললাম—আচ্ছা যোগীন্দ্র, এখানে যে ভাবে আছো, তাতে কি তোমাদের খুব অসুবিধা হচ্ছে।

তাড়াতাড়ি জিভ কাটল যোগীন্দ্র, বলল—না বাবু, সেকথা কইলে ধর্ম সইবো না ! এইখানে ত খাসাই আছি !

বললাম—তাহলে আজই চিঠি লিখে দাও চা-বাগানে, সে-ছোকরার আসার দরকার নেই !

হুকুম দিয়ে সরে এলাম নিজের ঘরে। আমার এখানে রাঁধনীবৃত্তি করে লক্ষ্মীর কী যে লাভ হবে না হবে, সে সব চিন্তা করবার অবকাশ ছিল না। চা-বাগানে, আসলে একটা ঘরের ঘরনী হতো সে, হয়ত এখানকার থেকে ঢের ভালো থাকত, কিন্তু সে-সব চিন্তা করার মতো মনের অবস্থা তখন ছিল না।

বাহাদুর কিন্তু ঘরামী ডেকে চালা তুলবার কোনো আগ্রহ-ই প্রকাশ করল না। দিন কয়েকের মধ্যেই ব্যাপারটা বোঝা গেল। বাহাদুর জলপাইগুড়িতে চাকরী পেয়েছে, সেখানে সে

চলে যেতে চায় নতুন বউকে নিয়ে। এখন বাবুজীর অনুমতি হয় ত'—

বললাম—যা তবে, ভাল চাকরী যখন।

ও বললে—তাহলে যাচ্ছি বাবু, আপনি একটু হুঁসিয়ার থাকুন, লোকে নানান্ বাজে কথা বলছে।

—কী বলছে।

বাহাদুর বললে—মেয়ে দুটো ভালো না।

মুহূর্তে জ্বলে উঠলাম একেবারে, বললাম—যা, ভাগ এখ্‌খুনি!

চলে গেল।

কিন্তু এতেই কি নিশ্চিন্ত হওয়া গেল? বাহাদুর চলে যাবার পরদিনই এলো সেই চা-বাগানের ছোকরা। মিশকালো চেহারা, রোগা, লম্বা, দাঁতগুলো বাঁধানো। বছর ত্রিশ-বত্রিশ বয়স হবে, কিন্তু দাঁতে রোগ হওয়ায় দাঁত ফেলে বাঁধানো দাঁত পরতে হয়েছে।

যোগীন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে দেখা করতে এলো আমার সঙ্গে। বললে—পাণ্ডব বর্জিত দেশে তবু আজকাল দু'চারজন ভদ্রলোকের দর্শন পাচ্ছি।

বললাম—বসুন।

হেসে বললেন—বসব ত বটেই, একটু চা-ও খাবো।

চায়ের কথা বলবার জন্য যোগীন্দ্র অপসৃত হতেই, টেবিলের ওপর একটু ঝুঁকে নিম্নকণ্ঠে বললে—দাদা, ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় করলে জঙ্গলে বাস করা চলে না। আমি ছোটটাকে চাইছি, আপনি বাদ সাধছেন কেন? বাপ রাজী হয় ত, মেয়ে রাজী হয় না। বলে—বাবু নিজের মুখে না বললে যাবো না। দেখুন দেখি কী ব্যাপার!

বিরক্ত হয়েই বললাম—একটু ব্যক্তিগত আলোচনা হয়ে যাচ্ছে নাকি?

বললেন—কিন্তু, ব্যক্তিগত আলোচনাই যে করতে এসেছি। বেশী সময় নেই, একজনদের লরী ধ'রে এসেছি, আধঘণ্টার মধ্যে কাজ শেষ করে ফিরে যাবো।

বলে ফেললাম—আজই নিয়ে যাবেন নাকি ?

একটু হাসলেন ভদ্রলোক, বললেন—আরে না-না কথাবার্ত্তা সব পাকা করে যাবো, নিয়ে যাবো সামনের রোববার ছুটির দিনে, বুঝলেন ?

বললাম—ওর বাপ আর দিদিকেও নিয়ে যাবেন নাকি ?

এবার হা-হা করে হেসে উঠলেন ভদ্রলোক, বললেন—ক্ষেপেছেন। বড়োটিকে আপনি রাখুন না। আমার ত মনে হয়, দুই বোনের বড়টিই দেখতে শুনতে খাসা। আর বড়টি যেখানে থাকবে, বাপও সেখানে। বাপের বেশী স্নেহ ঐ বড়টির ওপরে।

বললাম—আমার রাখারাখির প্রশ্ন নিয়ে আপনি মাথা ঘামাচ্ছেন কেন ? ওর অবস্থা দেখে ওদের এখানে থাকতে দিয়েছি এই পর্যন্ত।

তেমনি হাসতে লাগলেন ভদ্রলোক, বললেন—দাদা, চেপে যান। এখানকার সবার নাড়ি-নক্ষত্রের খবর এই শর্ম্মার জানা। ইভান্স সাহেবের সঙ্গে আসতে-যেতে আমারও আলাপ হয়েছে। তার কাছ থেকে স্যর শুনিনি আপনার গল্প ? সেই কালজানি নদীর ধারে বাড়ি—আলিপুরদুয়ারের কাছে—একটা মেয়েকে নিয়ে আপনারা দুজনে—ভাগাভাগি করে—! প্রথমটায় ক্রোধে যেন জ্বলে উঠেছিলাম, কিন্তু শুনতে শুনতে কেমন যেন একটা আতঙ্ক এসে অধিকার করল মনটাকে। একটি মেয়েকে নিয়ে আমার ও ইভান্সের উচ্ছৃঙ্খলতার কথা পর্যন্ত ইনি যখন জানেন, তখন আমার আরও সব কথাও ওঁর পক্ষে জানা আশ্চর্য নয়।

পরক্ষণেই মনে হলো—এতে এতো ভয়ের কী আছে !

ইতিমধ্যে চা নিয়ে এলো যোগীন্দ্র আর পিছনে-পিছনে লক্ষ্মী। সেদিনকার সেই গোলাপী শাড়ীটা পরনে। চা-বাগানের লোকটি ওর দিকে এমন বিশ্রী ভঙ্গীতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল যে, আমার শরীরে একটা যেন জ্বালা ধরে গেল।

লক্ষ্মী পরক্ষণেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বটে, কিন্তু আমার মনটাকে সেই বিক্ষুব্ধ অগ্নিশিখাই যেন পুড়িয়ে-পুড়িয়ে মারতে লাগল।

চা-পর্ব শেষ হতেই বললাম—আপনাকে খালি হাতেই ফিরে যেতে হবে। লক্ষ্মীকে আমি দেবো না।

আবার একটু হাসলেন ভদ্রলোক, বললেন—তা ছাড়বেন কী করে, অমন রাঁধুনী পেয়েছেন—

বললাম—না, রাঁধুনী নয়।

অদূরে দাঁড়িয়েছিল যোগীন্দ্র, বলে উঠলাম—দেখ যোগীন্দ্র, তোমার প্রস্তাবেই আমি রাজী। আমি লক্ষ্মীকেই রাখব। মাসে-মাসে একশো কেন, একশো বিশ টাকা করে দেবো আমি।

লোকটির মুখের হাসি গেল মিশিয়ে। খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকবার পরে উঠে দাঁড়ালো। হ্যাটটা মাথায় দিতে দিতে বলে উঠল—চায়ের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু, যাবার আগে একটা কথা বলে যাই, কাঁচা পয়সা খুব পান বুঝি? ইভান্সের কাণে কথাটা তুলতে হবে।

বলেই গটগট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি। সিঁড়ি দিয়ে ঝড়ের বেগে নেমে গেলেন সে-ও তার চলার শব্দে বুঝতে পারলাম।

যোগীন্দ্র বিস্মিত হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল, বললে—আপনে কী কইলেন বাবু। রাখবেন লক্ষ্মীরে।

কণ্ঠে জোর এনে বললাম—হ্যাঁ। তোমরা নীচে থাকবে, লক্ষ্মী থাকবে আমার কাছে ওপরে। মাসে-মাসে ঐ যা বললাম, একশো বিশ টাকা।

সংসার যেমন বিচিত্র, বিচিত্র তেমনি মানুষের মন। আমাকে পেয়ে বসল যেন কিসের এক দুর্দান্ত জেদ। বাজার থেকে গোটাচারেক ভালো শাড়ী, জামা, সায়া, স্নো, সাবান, ইমিটেশন গোল্ডের গয়না, এসব নিয়ে ফিরলাম সন্ধ্যার একটু আগে। এক সোনা-দানা ছাড়া সবই এনেছি। লক্ষ্মীকে ডেকে বললাম—এই নাও। সব তোমার।

ও নত মুখেই বেরিয়ে যাচ্ছে, বললাম—কাল থেকে লোক রাখব, রান্না তোমায় করতে হবে না। মুখে কোনো ভাবান্তর নেই, নতমুখে কথাটা শুনে তেমনিভাবেই বেরিয়ে চলে গেল।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর ঘর বন্ধ করে বেতের চেয়ারে দেহ এলিয়ে দিয়ে বই পড়ছি, একটু পরেই আলো নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ব, হটাৎ দরজায় কার মৃদু করাঘাত! বাবু বাবু বলে কে যেন ডাকছে।

দরজা খুলে দেখি যোগীন্দ্র।

—কী ব্যাপার?

ও বললে—আমি ভাবলাম ঘুমাইয়া পড়লেন নাকি? দরজাটা খোলা রাখেন, লক্ষ্মী আইতাছে। তেমনি ভাবলেশহীন মুখ, আবেগ-তিরোহিত কণ্ঠস্বর।

এক মুহূর্তে যেন ভয় পেয়ে গেলাম। দরজার কবাট দুটো ধরে বললাম—না না আসতে হবে না। তারপরেই কবাট দুটো ধরে সজোরে বন্ধ করে দিলাম।

সকাল থেকে শুরু হলো আরেক খেলা। আমি যেন পালিয়ে বেড়াতে লাগলাম বাড়ি থেকে। ও যে ভালো একটা শাড়ী পরে গলায় সস্তা সোনালী হার, হাতে চুড়ি, কানে রিং ঝুলিয়ে আমার ঘরে ঢুকে ওর প্রতিদিনকার কাজ করে চলেছে, সে যেন আমি দেখেও দেখলাম না।

কিন্তু, রাত্রে আবার সেই করাঘাত। আবার আমার সেই তীব্র প্রতিবাদ। যোগীন্দ্র আমার আচরণে ক্রমাগতই বুঝি অবাক হচ্ছে! বললাম—আমাদের ব্যাপারে তুমি থাকো কেন যোগীন্দ্র? আমাদের ব্যাপার আমরাই বুঝব!

বলে, সজোরে দিলাম দরজা বন্ধ করে। এবং তার পরদিনই এমন একটা ঘটনা ঘটে বসল অকস্মাৎ, যা না ঘটলে আমার এ কাহিনী বলবার কোন আবশ্যকতাও হতো না!

পরদিন সাইকলে নিয়ে ফিরতে-ফিরতে আমার সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

ফিরে বসবার ঘরে দেখি, ইভান্স বসে রয়েছে, তার সামনে হুইস্কির বোতলটা খোলা।

—ইভান্স?

হেসে বললে—আরে এসেছি কি এখন! বেলা তখন তিনটে। হোয়ট এ সুইট থিং! শুনলাম, শেষপর্যন্ত তুমিও 'বঙ্কুবাইন' রেখেছ! যা ছিল ষ্টকে, নিয়ে এলাম। লেট আস্ সেলিব্রেট।

বোধ হয় সংসারে এমনি করেই পাপ এসে প্রবেশ করে সন্তর্পণে। নইলে, সব ভুলে, সে রাত্রে প্রবৃত্তির কাছে বশ্যতা স্বীকার করব কেন? হুইস্কির বোতলটা যেন আমাকে চুম্বকের মতো টানতে লাগল! আমি পানাসক্ত নই, ইভান্সের সঙ্গে যখন জুটে যাই, তখন আর সংযমের বন্ধন থাকে না! হয়তো কৈশোর-যৌবনের সেই অবহেলাই যে পুঞ্জীভূত অভিমানসৃষ্টি করে রেখেছে অন্তরের অন্তস্তলে, সেই অভিমানের বিশুষ্ক পথ ধরেই পাপের স্রোত এলো প্লাবনের আকার ধারন ক'রে। কয়েক পেগ পেটে পড়বার পর দুজনে যখন খোশগল্পে মেতে আছি, ইভান্স তুলল কালজানি নদীতীরের সেই মেয়েটির কথা। দুটি পশু মিলে একটি মাংসখণ্ডকে একই কক্ষে পরস্পর কী ভাবে যে গ্রাস করেছিলাম, তারই খোশগল্পে মত্ত হয়ে গেলাম দুজনে।

অবশেষে ও বললে—আমি কাল ভোরেই চলে যাবো। দিস ইজ অ্যান্ অফিসিয়াল ভিজিট। সুতরাং এই একটি রাত এনজয় করে নিতে দাও। ব্রিং ইওর বঙ্কুবাইন।

টলতে টলতে নেমে এলাম নীচে। দরজায় টোকা দিয়ে ডাকলাম—যোগীন্দ্র।

ভীত সন্ত্রস্ত মানুষটি কোনক্রমে দরজা খুলে দিলো। জড়িতকণ্ঠে বললাম—লক্ষ্মী কই?

—শুইছে।

রেগে বললাম—ডাকো। আসতে বলো ওপরে।

উঠে এলাম। কিন্তু কোথায় লক্ষ্মী? যোগীন্দ্র এসে দাঁড়ালো দরজার গোড়ায়, বলল—বাবু?

—কী?

—লক্ষ্মী ভয় পাচ্ছে।

বললাম ড্যাম্ ইওর ভয়। আসতে বলো। সাহেব আমার বন্ধু।

যোগীন্দ্র চলে যেতে টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো ইভান্স, বললে—লেটস্ গেট্ ডাউন দেন।

তাই হলো। আমরা দুজনেই নেমে এলাম নীচে। ওদের দরজাটা খোলা। ভিতরে হ্যারিকেনের স্বল্পালোক বাইরে থেকেও অনুভব করা যায়।

ধারালো কণ্ঠে ডেকে উঠলাম—যোগীন্দ্র?

ঘর থেকে বেরিয়ে এলো যোগীন্দ্র, বলল লক্ষ্মী কাঁদে বাবু।

—ড্যাম ইট্। বাইরে আসতে বলো।

যোগীন্দ্র কোনো কথা না বলে, ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো বাইরে। তারপরে চলতে লাগল গেটের দিকে।

—কোথায় যাও?

এক মুহূর্ত ফিরে দাঁড়ালো, বললে—আমি বাইরে গিয়া মাঠের ধারে একটু বসতাছি বাবু, আধঘণ্টার মধ্যে ফিরা আসব।

চলে গেল। মস্তিষ্কে তখন অগ্নিশিখা জ্বলছে লেলিহান শিখায়, নইলে বুঝতে পারতাম মেয়েকে দুটি পশুর সামনে ছেড়ে দিয়ে বাপ হয়ে সে বাইরে চলে গেল কোন লজ্জার দীপালোক থেকে মুখ লুকিয়ে থাকতে।

আমরা দরজার কাছ বরাবর পৌঁছেছি প্রায়, এমন সময় ঘটে গেল সেই আশ্চর্য ঘটনাটা। খোঁপা-ভাঙা চুলের রাশি এলিয়ে পড়েছে, দরজার বাইরে এসে দাঁড়ালো—সরস্বতী। সেই ঠোঁটের কোণে মৃদু মৃদু হাসি।

ইভান্সের চোখ দুটি জ্বলে উঠল। সে এগিয় এসে ওকে প্রায় ধাক্কা

দিয়েই ফেলে দিলো মেঝের ওপরে। আর একটা ভয়ার্ত চীৎকার করে লক্ষ্মী বেরিয়ে এলো তীরবেগে। বাইরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার বুকের ওপর, বলতে লাগল—এ তুমি কি করলে—এ তুমি কী করলে!

আমাকে এমন করে ও ধরেছে, যে ওকে ছাড়াতে পারছি না সহজে! কিন্তু সেই বেপথুমান দেহভার যেন আমাকে প্রবল নাড়া দিয়ে সচকিত করে তুললে। মুহূর্তে ব্যাপারটা যেন চোখের সামনে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠল! ওকে ছাড়িয়ে কোনক্রমে ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলাম। সরস্বতী উঠে দাঁড়িয়ে হি হি করে হাসছে, আর হিংস্র পশুটা প্রাণপণে টানছে তার আঁচলখানা ধরে।

এলোপাথারি কতকগুলি ঘুঁষি যে ইভান্সকে মেরেছিলাম খেয়াল নেই, এটুকু মনে আছে, সে শুধু অস্ফুট কণ্ঠে বলছে—এনাফ্ এনাফ্ মায় বয়।

সে এক ভয়ঙ্কর রাতই গেছে বটে! ফিরে এলো যোগীন্দ্র, আমি আর সে, দুজনে মিলে ওর শুশ্রূষা করতে লাগলাম রীতিমত। লক্ষ্মী রান্না ঘরে গিয়ে আলো জ্বালল জল গরম করতে।

ভোর হতে না হতে ইভান্স চলে গেল।

তারপরে, আর মাথা তুলে তাকাতে পারি না ওদের দিকে। যোগীন্দ্রকে বললাম—কী করছে সরস্বতী?

—ঘুমাচ্ছে।

বললাম—আমার একটু কথা রাখবে যোগীন্দ্র?

—বলেন?

বললাম—কাল যা হয়ে গেছে, এর জন্য দায়ী আমি। ইভান্স আমার বড়ো সাহেব, সে চটে গিয়ে আমার চাকরীই খেয়ে দেবে কিনা জানি না। তবু আমি ভয় পাই না! তুমি বাজারের দিকে যাও ত? লোকজন খুঁজে বার করো। পুরুত ঠাকুর-টাকুর নিশ্চয় পাবে। আজ হোক—কাল হোক—অগ্রহায়ণ মাস পড়ে গেছে যখন—দিন নিশ্চয় খুঁজে পাবে—বিয়ের দিন দেখ। আমি সরস্বতীকে বিয়ে করব।

—কী বললেন বাবু!

বললাম—বিয়ে করব। কানে শুনতে পাচ্ছ না?

সবিস্ময়ে বললে—বিয়া! ঐ পাগল মেয়েকে!

—হ্যাঁ, ঐ পাগল মেয়েকেই। তুমি আর দেরী কোরো না, শীগগির যাও।

বলল—আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি—

কাল ত দেখেছ আমার ব্রাহ্মণত্ব। বললাম কেন আপত্তি করছ যোগীন্দ্র? কেন আমার মনের ভাব বুঝতে পারছ না? যে-মেয়েটা সারাজীবন নর-পশুদের অত্যাচার সইল, তাকে আমিও কাল রক্ষা করতে পারলাম না!

—রক্ষা ত করেছেন বাবু।

বললাম—রাক্ষসের হাতের ছোঁয়াও ত লেগেছে!

ও চুপ করে আছে দেখে ওর দুটি হাত ধ'রে বলে উঠলাম—যাও যোগীন্দ্র, আজ যদি বিয়ের দিন থাকে ত, আজই। আমি শহরে যাচ্ছি। টাকা তুলে আনছি।

যেন ঘূর্ণির মতো দুর্নিবার বেগে একটা ঘটনার স্রোত আমাকে উড়িয়ে নিয়ে চলছে! সহর থেকে ফিরতে-ফিরতে সেদিন রাত হয়ে গেল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছি, দেখি জানালার ধারে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে—লক্ষ্মী!

ডাকলাম, বললাম—টাকাগুলি তুলে রাখো। তোমার বাবা কোথায়?

—বাইরে গেছে।

—আসে নি?

—আসছিল। আবার গেছে। কালই নাকি বিয়া।

চুপ করে রইলাম। ও টাকা নিয়ে বাক্সে রেখে দিলো। বেতের চেয়ারাটায় এসে বসেছি। ও এগিয়ে এসে বলল—বসেন, চা আন্‌তেছি।

খপ্ করে ওর একখানা হাত ধরে ফেললাম, বললাম—লক্ষ্মী? তুমি খুশি হওনি?

হাতখানা বুঝি কেঁপে উঠল ওর, বললে—হ্যাঁ, হয়েছি।

তারপরেই চলে যাচ্ছিল হাত ছাড়িয়ে নিয়ে। বললাম—তোমার দিদি কোথায়?

—ঘুমাইতেছে।

একটু বিস্মিত হয়েই বললাম—এত ঘুম কেন?

ও বললে—কে জানে। কাল থিকা সে ঘুমাইতেছে, এত ঘুম দিদির কখনও দেখি নাই।

চলে গেল। একটু পরেই এলো চা নিয়ে। বললাম—বিয়ে ত কাল হয়ে যাবে। তুমি কী করবে? তুমি বরং—

হঠাৎ ও করল কী চোখে আঁচল দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এবং সেই যে বেরিয়ে গেল, পরদিন রাত নটার আগে তাকে আর চোখে দেখতেই পাইনি বললেই হয়।

যোগীন্দ্রর ব্যবস্থায় সেদিনটাই ছিল বিবাহের দিন। বললে—কন্যা অরক্ষণীয়া। আইজের তিথিতে বিবাহ দিলে ক্ষতি নাই।

জন চার-পাঁচেক লোক, একটা হ্যাজাক বাতি, পুরোহিত ঠাকুর যোগীন্দ্র মোটামুটি বিবাহের ব্যবস্থা মন্দ করেনি। বললে—নটার পর লগ্ন। আপনে ঘর থিক্যা বার হইবেন না। গাঁয়ের দুই-একজন বউ-ঝিরে কইছি, আপনারে চন্দনের ফোঁটা দিয়া যাইব, কন্যারে সাজাইয়া যাইব।

বৃদ্ধ এ সব কথা বলে, আর কোঁচার খুঁটে চোখ মোছে। বলে,—বাবু জীবনে কোন ভরসা ছিল না, আশাও ছিল না। আজ বুঝতাছি, মানুষের আশা-ভরসা ঐ মানুষের কাছেই। আপনার কাজকর্ম দেইখ্যা আজ আবার মনে হইতেছে, পৃথিবীটা আসলে মন্দ না। মানুষের অত্যাচার দেইখ্যা দেইখ্যা মনটা যেন পাষাণ হইয়া গেছিল, আজ বুঝতাছি, দ্যাশ বড়ো না, ধর্ম বলেন, ভাষা বলেন, তা-ও বড়ো

না, বড়ো হইতেছে ঐ মানুষ। আপনে বড়ো, তাই আপনার জাতও বড়ো, ধর্মও বড়ো, ভাষাও বড়ো।

তারপর যতোই সময় যেতে লাগল, ততই মনে হতে লাগল, কী এক অস্বস্তি যেন আমাকে ঘিরে ধরেছে। কিন্তু সময় ত বসে থাকে না। যথারীতি লগ্ন এলো, শঙ্খও বাজল, সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামলাম বরের আসনে বসবার জন্য, হঠাৎ কী হলো, যোগীন্দ্র ছুটে এসে ধরল আমার হাত, বলল—আপনে একবার ঘরের ভিতরে আসেন।

এলাম।

যোগীন্দ্র দরজা-জানালা বন্ধ করে দিলো। বললে—ঐ দেখেন।

সরস্বতী দেয়ালে মাথা হেলিয়ে বসে আছে, বাপের একটা ধুতি পরেছে, হাতে সেই কাঁচের চুড়ি দু'গাছিও নেই।

আশ্চর্য হয়ে বললাম—কী হলো!

যোগীন্দ্র বলল—ও শান্ত হইয়া গেছে বাবু। কয়, আমার আবার বিয়া কি? আমি ত বিধবা। আমার কানুরে লইয়া গেছে, তারে ফিরাইয়া আইন্যা দাও।

বলতে-না-বলতে উঠে দাঁড়ালো সরস্বতী, এগিয়ে এলো আমার কাছে, বলল—কানু আসুক, তখন তোমার কাছে নিয়া বইস্যা বইস্যা গল্প করুম, ক্যামন? যাও গিয়া, বিয়াটা সাইরা আইস। আমি বিধবা, আমার এখন কাছে যাইতে নাই।

যোগীন্দ্র বলল—লক্ষ্মীরে সবাই মিইল্যা সাজাইছে। কিন্তু ঐ দেখেন বাবু, মাইয়া বইস্যা বইস্যা কান্তেছে, উঠব না।

চোখ পড়ল অন্য দিকে। আগুন-রঙা শাড়ীতে যেন ঘর আলো করে বসে আছে। মুহূর্তে মনে হলো, একটা বৃহৎ পাষাণের ভার যেন বুকের ওপর থেকে সরে গেছে। যোগীন্দ্রের মুখের দিকে তাকিয়ে লঘু কণ্ঠে বলে উঠলাম—বুড়ো বর পছন্দ হচ্ছে না আর কি!

সত্যিই সে এক অদ্ভুত রাত্রি। লক্ষ্মীর ছোট্ট হাতের মুঠিটা হাতের মধ্যে নিয়ে আবৃত্তি করে চলেছি—'যদিদং হৃদয়ং তব।'… আর সঙ্গে সঙ্গে যেন বহুদূর থেকে ভেসে-আসা কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি আমার হারানো বোন অতসীর। কোন নক্ষত্রের মধ্য থেকে সে যেন খুশী-ভরা মন নিয়ে ডেকে উঠেছে—সেজদা! সেজদাগো।

আমার বিবাহ প্রসঙ্গে তার থেকে উৎসাহী ব্যক্তি আমার ছিল কে? তারায় ভরা আকাশটা জুড়ে যেন তারই খুশীর হাসি ঝিলিমিলি করে উঠেছে।

॥ দুই ॥

চল্লিশোত্তর বয়সে এই যে হঠাৎ বিবাহ করে বসলাম, এর সঙ্গে রাষ্ট্রনীতি অর্থনীতি, সমাজ-বিবর্ত্তন এ সবই যে ওতপ্রোতরূপে জড়িয়ে আছে, এ-বোধটা বিবাহের প্রথম রাত্রি থেকেই আমার চিন্তায় সুস্পষ্ট একটি রূপ ধারণ করছিল। জটিল রাষ্ট্রনীতির ও অর্থনীতির বলি হয়ে ওরা যদি আমার দরজায় এসে না পড়ত, তা হলে লক্ষ্মীকে আমার পাওয়া হতো না। আত্মীয়-স্বজন পরিত্যক্ত হয়ে যদি অমন ভবঘুরের মতো না বেড়াতাম, অথবা রেলওয়েতে ঘুরে ঘুরে টিকিট দেখে বেড়ানোর চাকরী ছেড়ে, ইভান্সের অধীনে এই উত্তর-বঙ্গের অরণ্য-প্রান্তে কর্মগ্রহণ ক'রে যদি না উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতাম,—তাহলে ব্রাহ্মণ-সন্তান হয়ে অতি সহজেই ভিন্ন এবং তথাকথিত নিম্নবর্ণের ভার্যা গ্রহণ ক'রে সমাজ-বিবর্তন-স্রোতে তৃণখণ্ডের মতো ভাসমান হতাম না।

যাকে বলে বাসর-রাত্রি,—সে রাত্রিতে আমি আর লক্ষ্মী চুপচাপ বসে আছি, ঠিক পাশাপাশি নয়, একটু দূরত্ব আছে দুজনার মধ্যে, ঘরে আর কেউ নেই।

অত্যন্ত আকস্মিক এই ঘটনা, কিন্তু ঘরে বসে এই 'বাসর' রাত্রে কোনো কিছুকেই আর 'আকস্মিক' মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছিল, এ হতোই। বাঁধাধরা সংলাপ বলবার জন্যে অভিনেতা যেমন স্বাভাবিক ভাবেই মঞ্চ প্রবেশ করে, তেমনি আমি এক বিচিত্র সাজসজ্জায় বিচিত্র ভঙ্গিমায় চুপচাপ বসে আছি। ঘটনাটা বিচিত্র হয়েও যেন অতি সাধারণ।

ঘরের সেখানে বসে আছি, তার সামনেই পড়ে খোলা জানালা। শীতের আমেজ বয়ে নিয়ে বাতাস আসছে সেই জানালা দিয়ে, কিন্তু

ভ্রূক্ষেপ-নেই, আমি বুঝি নিজের অজ্ঞাতেই তাকিয়ে আছি একটি নক্ষত্রের দিকে।

হঠাৎ যেন চমক ভাঙলো। নিশ্চয় বেশ রাত হয়ে গেছে। কোন দিকে কোন সাড়া নেই।

একটু নড়ে-চড়ে বসে নববধূকে বলে উঠলাম, শোবে না?

স্থির পাষাণ-প্রতিমায় এতক্ষণে জেগে উঠল স্পন্দন, মৃদুকণ্ঠে বললে—আপনি শুয়ে পড়েন।

পড়লাম শুয়ে। সে করল কী, আমার পায়ের কাছে বসে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। পায়ে আরাম যে হচ্ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার বলা উচিত ছিল—ছিঃ ছিঃ, ও কী করছ?

কিন্তু তা বলিনি, পরিচারিকার হাত থেকে পাওয়া সেবার মতো আমি নীরবেই তার পরিচর্যাটুকু উপভোগ করতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ কাটল। বললাম—তোমার বাবা কই?

—নীচে।

—দিদি?

—নীচে।

আর কোনো কথা হলো না। কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম খেয়াল নেই, যখন নিদ্রাভঙ্গ হলো, তখন ভোর হয়ে গেছে। লক্ষ্মী ঘরে নেই, কখন চলে গেছে কে জানে!

অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই চলতে লাগল সংসারের চক্র। যোগীন্দ্র এলো চা নিয়ে। লক্ষ্মী যেমন রান্নাঘর নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তেমনি ব্যস্ত হয়ে পড়ল; শুধু শুভ্রবেশধারিণী আমার কাছ থেকে পালিয়ে-পালিয়ে বেড়াতে লাগল বুঝতে পারলাম।

বেলা একটু বাড়লে, প্রতিবেশিনী যাঁরা কাল রাত্রে এসেছিলেন, তাঁরা এলেন, এলেন পুরোহিত। বিবাহের বাকী অনুষ্ঠানগুলি সেরে ফেলতে ফেলতে দ্বিপ্রহর গড়িয়ে গেল।

দুপুরে একটু বিশ্রাম করে বিকেলের দিকে বেরিয়ে পড়লাম সাইকেল নিয়ে। যোগীন্দ্রকে ডেকে বললাম—আমি যাচ্ছি। আজ কালরাত্রি। রাত্রে আর ফিরব না। দূরের এক গাঁয়ে এক রায়তের বাড়ীতে 'দাদন'-এর ব্যবস্থার ব্যাপারে যাওয়ার কথা আছে, সেখানেই যাচ্ছি অফিসের কাজে। সেখানেই থাকব। তোমরা ভেবো না।

কিন্তু, রায়তের বাড়ী সত্যিসত্যিই আর গেলাম না। গেলাম আলিপুর-দুয়ারে আমার সেই বন্ধুর বাড়ী, যাঁর কাছ থেকে প্রথমে আমি 'নক্ষত্র সম্বন্ধীয়' একখানা বইয়ের সন্ধান পাই; এবং সে তখনো জানে না যে, তার সেই ক্ষুদ্রাকায় বইখানা পড়েই আমার নক্ষত্রলোক-সম্বন্ধে অমন নেশা জাগে।

সে বললে—কী ব্যাপার। হঠাৎ?

সংক্ষেপে বললাম—এলাম। রাতটা থাকব।

—একা? ইভান্স কই?

সাধারণতঃ তার কাছে যখনই যেতাম, ইভান্স সঙ্গে থাকত। তার বাড়ীতে তিনজনে বসে পানীয়ের পালা শেষ করে পরবর্তী তৃষ্ণার তাগিদে অন্ধকার পল্লীর পথে বেরিয়ে পড়তাম।

বললাম—একাই এসেছি।

সে একটু হেসে বললে—বোতল বার করি?

—না।

আশ্চর্য হয়ে সে বললে—কী ব্যাপার? এমন নিরাসক্ত যে?

বিবাহের কথা ইচ্ছা করেই ভাঙলাম না। বললাম—বড়ো শ্রান্ত, একটু বিশ্রাম নিতে দিন একটা রাত্রি। সকালেই চলে যাবো।

বন্ধু আমার মনের অবস্থা বুঝে সে রাত্রে আর কোন কথা তোলে নি। আমিও বিছানায় শোওয়া মাত্রই তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। সকালে চা-পর্বের অবকাশে বন্ধুই প্রসঙ্গ-উত্থাপন করল। বললে—এরকম ঘুম ত আপনার আগে কখনো দেখি নি! রাজ্য-জয়-করে আসা পৌরাণিক বীরের মতোই সুপ্তি-মগ্ন হয়ে পড়েছিলেন যে একেবারে!

কথাটা বেশ লাগল—স্বস্তি। বার কয়েক কথাটা উচ্চারণ করলাম। তারপরে বললাম—আচ্ছা, ইভান্স্ এখানে এসেছিল দিনকয়েকের মধ্যে?

ও বললে—কই, না?

তারপরে আমার দিকে ঝুঁকে ঈষৎ আগ্রহের সঙ্গেই বললে—কেন বলুন ত?

—কিছু না। এমনি।

বন্ধু বললে—যা ব্যাপার আপনার লক্ষ্য করছি, তাতে মনে হয়, একটা কিছু গুরুতর নিশ্চয়ই হয়েছে। কী হয়েছে বলবেন না? ইভান্সের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে?

—না, তা ঠিক নয়,—বললাম,—তবে একটু মতান্তর হয়েছে আর কী?

বন্ধু একটু চিন্তিত ভঙ্গিমায় বললে—বড়ো একরোখা মানুষ, চটিয়ে দেননি ত?

বন্ধুর মুখ থেকে বুঝি ঐ 'একরোখা মানুষ' কথাটাই আমার মন শুনতে চাইছিল। সেই মারামারির পর থেকেই আমার মন ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে আছে, বাইরে তার প্রকাশ হয়ত ছিল না। বন্ধুর কথায় মনের আশঙ্কা আরও গভীরতর হলো। এখন মহাকালগুড়ির বাসায় ফিরে গিয়ে হয়ত টেবিলে দেখব ইভান্সের সই করা চিঠি,—ইওর সার্ভিস ইজ নো মোর রিকোয়ার্ড। তোমার চাকরীর আর দরকার নেই।

বন্ধু বললে—কী? চুপ করে ভ্রূ কুঁচকে এত গভীরভাবে ভাবছেন কী?

—না, তেমন কিছু না।

বন্ধু বললে—কথায় বলে প্রেমের ক্ষেত্রে কোন বন্ধুকে সঙ্গে রাখতে নেই। আপনাদের কাণ্ড এতদিন ধরে দেখে আসছি, সে কাণ্ডের সঙ্গে আমিও যে জড়িত ছিলাম না এমন নয়, কিন্তু আপনাদের দুজনের মতো

বাড়াবাড়ি করতাম না। বাড়াবাড়ির ফলটা এবার বুঝুন? কোন্ মেয়েটাকে নিয়ে গোলমাল? এখানকার সেই কালজানি-নদীধারের খুপ্ড়ির সেটি, না—?

বাধা দিয়ে বলে উঠলাম—না-না, সে-সব কিছু নয়।

—তবে?

যে-কথা বলব না ভেবেছিলাম, সে কথাই বলে ফেললাম,—পরশু রাত্রে আমি হঠাৎ বিয়ে করেছি।

বন্ধু ত আকাশ থেকে পড়ল, বললো—বিয়ে! সে কী?

ধীরে ধীরে সব ওকে বললাম। নোয়াখালীর বাজ্রা গ্রাম থেকে ছিন্নমূল যোগীন্দ্র পথে আসতে আসতে চেনা একটি লোকের পাল্লায় পড়ে। সেই লোকই শেষ পর্যন্ত সুযোগ বুঝে সর্বনাশ করে তার বড় মেয়ে সরস্বতীর। সেই অবস্থায়ও লোকটির উটে দাঁড়াবার চেষ্টার অন্ত নেই, আসে আসামে। সেখানে সন্তান হয় সরস্বতীর। সন্তানের পিতৃপরিচয় কী দেবে? বলে—পিতার নাম ভগবানচন্দ্র। সামাজিক নিন্দার ভয়ে বিধবার বেশে দিন কাটাতে থাকে সরস্বতী। দীর্ঘদিন কেটে যায়, সরস্বতীর বোন পাঁচ বছরের ছোট মেয়ে লক্ষ্মী আজ বিশ বছরের তরুণী, সরস্বতীর ছেলে কানু প্রায় চৌদ্দ বছরের কিশোর। এমন সময় দেখা দিলো আসামের রাজনৈতিক লীলাচাঞ্চল্য। বোনকে রক্ষা করতে সরস্বতী এগিয়ে যায় পিশাচদের সামনে, আর মাকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসে কানু, যোগীন্দ্র তখন একটা গাছের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। কানু যখন মাথায় প্রচণ্ড আঘাৎ পেয়ে রক্তাপ্লুত অবস্থায় মাটিতে পড়ে যায়, তখন সরস্বতী আঘাতকারী দুর্বৃত্তের মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে উন্মাদিনীর মতো হেসে ওঠে। বলে ওঠে, বেশ হয়েছে, নিজের ছেলেকেই মেরে ফেলেছে।

থমকে দাঁড়ায় দুর্বৃত্ত। কে এ-মেয়েটি? সরস্বতীর সন্তানকেই সে মেরে ফেলেছে? পাগলের মতো চীৎকার করে ছেলেকে কোলে করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায় লোকটি, কিন্তু কানু তখন আর

ইহজগতে নেই। যোগীন্দ্র সরস্বতী আর লক্ষ্মীর হাত ধ'রে ঘুরতে ঘুরতে উপস্থিত হয় মহাকালগুড়িতে। আবার সে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে উন্মাদিনী কন্যার হাত ধরে। কিন্তু, একটা কথা আজও বুঝতে পারে না যোগীন্দ্র, আসামে গোলমাল বাঁধাতে বাইরে থেকে এলো কী করে সেই লোকটা ?

বন্ধু চুপচাপ বসে শুনে যায় আমার কথা। এবং সব কথা আমার শেষ হয়ে গেলেও মুখ তুলতে পারে না অনেকক্ষণ। তারপরে এক সময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমার দিকে তাকায় সে। বলে,—আদর্শ কাজ করেছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু আপনাতে আর আপনার স্ত্রীতে মিশ খাবে কী করে, তাই ভাবছি।

বললাম—কেন ? মানিয়ে নেওয়া কি খুবই কঠিন ?

খুবই কঠিন,—বন্ধু বললে—আপনি ব্রাহ্মণ, আর সে জাতে যুগী, এ-তুলনা আনছি না। আনছি মনের গঠনের কথা। আপনার রুচি আর শিক্ষার কাছে তার স্থান হবে কতটুকু! দেখা যাক, এ নিদারুণ এক্সপেরিমেন্ট্।

আমিও ওর প্রতিধ্বনি করলাম দেখা যাক্।

বন্ধু বললে—কিন্তু এর সঙ্গে ইভান্সের কী সম্বন্ধ ?

ইভান্সের প্রসঙ্গও বিস্তৃতভাবে বললাম বন্ধুকে। সে বললে—সর্ব্বনাশ করেছেন! ইভান্সকে যতদূর জানি, ও এর শোধ না তুলে ছাড়বে না!

—ঠিক এই কথাটাই ভাবছি।

বন্ধু বললে—চাকরী থেকে পর্যন্ত আপনাকে ছাড়িয়ে দিতে পারে। ও ইন্‌স্‌পেক্টর হলে কী হবে, মালিকের ও ডান হাত বাঁ হাত। মালিকের ও জামাই, তা জানেন ত ?

বললাম—জানি।

—তবে ? এক কথায় ছাড়িয়ে দিতে পারে কিনা, বলুন ?

—তা পারে।

—তহলে ?

অল্প একটু হেসে বললাম—ভিন্ন কাজ খুঁজে নিতে হবে।

—এতই সোজা ?

বললাম—সোজা নয়, কিন্তু সে এক্স্‌পেরিমেণ্টও আমাকে করতে হবে। আমি ওদের সংসারকে মাথায় নিয়েছি, মাথায় নিয়েই চলব, দেখি, ভাগ্য আমাকে কোথায় নিয়ে ফেলে। সহজে হার আমি মানব না।

বন্ধু বললে—আপনার শুভকামনাই করি।

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম—যাবেন না একবার মহাকালগুড়িতে ? আমার বৌকে দেখতে ?

বন্ধু বললে—না। নতুন করে দেখবার কী আছে ? স্টেশনের প্লাটফর্মে, শোচনীয় তাঁবুর তলায়, সংকীর্ণ ছাউনীতে 'মূঢ় ম্লান মূক মুখ' বহু দেখেছি। তাদেরি একজনের মুখে আপনি হাসি ফোটাতে চাইছেন, দেখা যাক্ সে হাসি ফোটাতে পারেন কি না।

নিরুত্তরে, একটু হেসে সাইকেলে উঠে বসলাম।

বেশ একটু বেলাই হয়ে গেল পৌঁছুতে পৌঁছুতে। গেট খুলে পেরিয়ে যেতে যেতেই সরস্বতীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল প্রথমে। সেই শুভ্র বিধবার বেশ, সেই চোখের নীচে কালির বৃত্ত, সেই অল্প হাসির রেখা-ফুটে-ওঠা কোমল দুইটি ঠোঁট।

বললে—কোথায় গেছিলে ? কানুরে দেখতে ? কেমন আছে ? ভালো আছে ত ? কইছ ত, যে, মায়ের কাছে আসবার কাম নাই, যেন মন দিয়া পড়াশুনা করে।

কোন উত্তর দিতে পারলাম না ওর কথার, শুধু বললাম—বাবা কোথায় ?

বললে—বাপে বাজারে গেছে। উপরে যাও, বসো গিয়া, আমি আসতেছি।

সাইকেল যথাস্থানে রেখে ওপরে এসে ঢুকলাম আমি। 'ঘরের সব কিছুই সুবিন্যস্ত, কোনমতে পোষাক বদলে বিছানায় গা-টা এলিয়ে দিলাম।

একটু পরেই এলো লক্ষ্মী, লাল শাড়ীর ঘোমটা মাথায় দিয়ে, হাতে চায়ের কাপ আর একটা প্লেটে খানকয়েক লুচি। টিপয়টা কাছে টেনে এনে ও সব যত্ন করে সাজিয়ে রাখছে, আমি তা দেখতে দেখতে ঈষৎ নিম্ন কণ্ঠে ডেকে উঠলাম—লক্ষ্মী ?

—কী ?

বললাম—কাছে এসো ?

একটু যেন কেঁপে উঠল ওর সর্বশরীর, তারপরেই সামলে নিয়ে বিনীত দাসীর মতোই উত্তর দিলে,—কী, বলেন।

বললাম—তোমায় আর অতো রান্নাবান্না করতে হবে না, আমি লোক রাখব। বাহাদুরকেই না হয় আবার ডেকে পাঠাবো।

লক্ষ্মীর মুখে ফুটে উঠল মুহূর্তে ভারী ব্যাথাতুর একটা ভঙ্গিমা, বললে—কেন ? আমার রান্না ভালো না ?

—না-না, আমার কথা তুমি বুঝলে না। আমি বলতে চাইছি—

বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল—আমারে আর অপরাধী করবেন না !

বলেই আর দাঁড়ালো না, দ্রুত পায়ে ঘর থেকে চলে গেল লক্ষ্মী।

জলযোগ-পর্ব শেষ করে চুপচাপ শুয়ে আছি, এলো যোগীন্দ্র। বললে—বাবু, রাত্রে কোথায় ছিলেন ? খুব কষ্ট হইছে বোধ হয় ?

বললাম—না-না' কষ্ট কিছু হয় নয়। এক বন্ধুর বাড়ী ছিলাম।

যোগীন্দ্র আগের মতোই মাটিতে বসে পড়ছে দেখে বলে উঠলাম —এ কী, ওখানে কেন, খাটের ওপর এসে—

আমার কথা কেড়ে নিয়ে যোগীন্দ্র বললে—থাক্ বাবু, ঠিক আছি।

তারপর সে বসল বাজারের হিসেব নিয়ে। অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠলাম—ওসব এখন থাক্, আরও টাকা বার করতে হবে, কেনাকাটার আরও ত কিছু আছে, ফুল-টুল—

যোন্দ্রগী উঠে দাঁড়ালো, বললে—আমি লক্ষ্মীরে পাঠাইয়াদিতেছি।

চলে গেল। কিন্তু লক্ষ্মী এলো না, এলো সরস্বতী। বললে—শুইয়া যে?

উঠে বসলাম, বললাম—এই যে, এসো।

বললে—টাকা দিবা না।

বললাম—কিন্তু চাবি ত লক্ষ্মীর কাছে।

সরস্বতী একটু হেসে বললে—এই যে আমার কাছে, কাইরা আন্‌ছি। কিন্তু, চাবি তুমি নাও, বাক্স খোলো, আমার হাত কাঁপে।

—কেন?

—ডর পাই।

—ডর কেন?

বললে—তুমি যদি রাগ করো?

—রাগ করব কেন?

হটাৎ ছলছল করে উঠল ওর চোখ, বললে—পুরুষ মাইন্‌ষের রাগ বেশী। দেখছ না আমার দিকে চাইয়া? রাগ কইরা চইলা গেল আমারে বিধবার বেশে সাজাইয়া। কবে যে আসবে? আবার আমি লক্ষ্মীর লাল শাড়ীর মতন্ শাড়ী পইরে ঘরে-দোরে ঘুরাইয়া বেড়াইমু।

ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকতে পারলাম না আর। মনে হলো, এই অবস্থার জন্য যারা দায়ী তাদের কৃত অপরাধের ভার বুঝি আমার ওপরও এসে পড়েছে।

৺ কিন্তু হাসি মুখেই বললে—কী, চুপ কইরা যে? টাকা কই?

উঠলাম। উঠে, বাক্স থেকে টাকা বার করে ওর হাতে দিলাম, চাবিও দিলাম ফিরিয়ে। ও বললে, বাপেরে দেই গিয়া। আমি কি হিসাব-কিতাব রাখতে পারুম ?

চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে, আমারও মনে হলো, বাড়ী থেকে বেরিয়ে একটু এদিক-ওদিক ঘুরে এলে মন্দ হয় না। টেবিলে একবার নয়, দুবার নয়, বহুবার খুঁজলাম, কিন্তু ইভান্সের কেন, কেনো চিঠিই আসেনি। আর কারুর চিঠির জন্যে মনে মনে আমার অস্থিরতা ছিল না, ছিল ইভান্সের চিঠির জন্য। 'তোমার চাকরী নেই,—এই বার্তা বহন করে ওর চিঠিখানা এলে, আমি বোধ হয় একদিক থেকে আশ্বস্ত হতাম। রোগী প্রাণান্তকর কষ্ট পাচ্ছে বিছানায় শুয়ে,—চিকিৎসকও শেষ জবাব দিয়ে গেছে, এমন অবস্থায় মানুষ অনেক সময় কামনা করে না কি, যে, যা হবার হয়ে যাক, এ নিদারুণ কষ্ট ত আর চোখ চেয়ে দেখা যায় না। ঠিক তেমনি হলো আমার অবস্থা। চাকরী যাবেই, এ যেন আমার জানা, এখন যত তাড়াতাড়ি যাবার খবরটা আসে ততই মঙ্গল। তখন যোগীন্দর সঙ্গে একাসনে গিয়ে বসব আমি। ওরই মতো সর্বহারা হয়ে ঘুরে বেড়াবো। সেদিন একটা সমস্যার সমাধান হবে, ওর আর আমার মধ্যে শ্রেণীভেদ ঘুচে যাবে। সেদিন আমি আর 'মধ্যবিত্ত' থাকবো না, হয়ে পড়ব ওরই মতো পথের মানুষ, যাকে ভাষান্তরে বলে, প্রোলেটরিয়েট ?

বেরিয়ে এলাম। 'কোথায় যাই-কোথায় যাই' করতে করতে শেষ পর্যন্ত এলাম বাহাদুরের আড্ডায়। ওর পক্ষে আমায় দেখে অবাক হওয়াই স্বাভাবিক। উঠে বললে—বাবুজী! আপনি!

ছোট্ট খুপরী ঘর। জিজ্ঞাসা করলাম—তোর বউ কোথায় ?

বউটি ঘরের কোণেই দাঁড়িয়েছিল জড়োসড়ো হয়ে, যায়গাটা অন্ধকার ছিল বলে ঠিক বুঝতে পারিনি প্রথমটায়। তাকে দেখিয়ে বাহাদুর বললে—এই যে।

বউটি ধীরে ধীরে কাছে এসে হাত জোড় করে আমাকে নমস্কার

জানালে। একটা ভাঙা মোড়া এগিয়ে দিলে বাহাদুর। বললে—বসুন

বসলাম। বললাম—তোরা নাকি জলপাইগুড়ি যাচ্ছিস?

বাহাদুর কুণ্ঠিত স্বরে বললে হ্যাঁ বাবু।

—কেন? আমার কাজ আর করাব না?

বাহাদুর মুখ তুললে, বললে—আপনার কাজ করবার লোক ত রয়েছে।

—কোথায় রয়েছে? বললাম, তুই কিছু শুনিস নি? আমি বিয়ে করেছি যে!

বাহাদুর মুখ গম্ভীর করে চুপচাপ রইল।

বললাম কি রে, কি হলো? শুনিস নি?

বাহাদুর বললে—শুনেছি বাবু।

—বুঝেছি। নিমন্ত্রণ করিনি বলে রাগ করেছিস, না?

ও তাড়াতাড়ি বললে—না বাবু, না। তার জন্য নয়।

—তবে?

ও একটু ইতস্ততঃ করে বললে—আপনি এত বড়ো অফিসার, তায় ব্রাহ্মণ, ও মেয়ে আবার আপনার বউ কী?

যেন প্রবল এক ধাক্কা খেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছি। কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারলাম না। বাহাদুরেরর বউটি বোধহয় আমার মনের ভাব কিছুটা আন্দাজ করে থাকবে। প্রথম থেকেই লজ্জায় আর সংকোচে নীরব থাকবার পর এবার সে কথা না বলে আর থাকতে পারল না। বললে বাবুজী, আপনি বসুন, কিছু মনে করবেন না ওর কথায়। এবার দেশে গিয়ে সব দেখে শুনে ওর মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে।

—কেন?

বাহাদুরই কথা বললে—বাবুজী, দেশে খুব গোলমাল। রোজ মিটিং হচ্ছে, হরতাল হবার কথা হচ্ছে। একদল বলছে দার্জিলিং জেলাটাই তেশালের মধ্যে দিয়ে দাও, আরেক দল বলছে—শুধু নেপালী ভাষাটাই চলবে, বাঙলা চলবে না।

নেপালীভাষা ত মেনে নেওয়া হয়েছে।

—তা হয়েছে। তবে সাথ্‌সাথ্‌ বাংলা চলবে না।

—কেন ?

বহাদুর বলছে—কে জানে। সব রাগ গিয়ে পড়ছে বাঙালীর ওপর।

কিছু কিছু ব্যাপার আমিও শুনেছি। এও এক রাজনীতির খেলা। এ-খেলায় আবার কারা বলি হতে চলেছে, কে জানে! চিন্তা করতেই যোগীন্দ্রর ক্লিষ্ট মুখচ্ছবিটি ভেসে উঠল চোখের সামনে। যোগীন্দ্র বলেছিল—এখানে আছেন, হয়ত একদিন বলবে, এ-ও তোমাদের দেশ নয়, এখুনি পালাও এখান থেকে।

কিন্তু, সে সব আলোচনা করবার অবকাশও এখন নয়, মনও ছিল না ঐদিকে। বললাম—কিন্তু বাহাদুরের মত কী ?

বাহাদুর বললে—আমাদের মতামত কিছু নেই বাবু। নিজের ভাষায় কথা বলছি, এখন কোনো রকমে মোটা ভাত-কাপড়ে দিন কেটে গেলেই হলো।

—বুঝলাম। কিন্তু, সত্যিই কি আমার ওখানে কাজ করবি না ?

বাহাদুর বললে—বাবুজী, রাগ করবেন না। জলপাইগুড়িতে একটা কাজের সন্ধান পেয়েছি, দু-তিন দিনের মধ্যেই চলে যাবো।

—সেই দু-তিন দিনও ত আমার ওখানে থাকতে পারতিস ?

—না বাবু, এখানে কোন কষ্ট নেই।

একটুক্ষণ থেমে থেকে বললাম—আসল কথা, আমার বউকে তোরা গ্রহণ করতে পারছিস না।

বাহাদুর চুপ করে রইল। ওর বউ বললে—ওর কথা ধরবেন না। বড়ো আদ্‌মীদের কতরকম খেয়াল হয়, ও তার কী বুঝবে ?

বাহাদুর তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বলে উঠল—আমার বাবু কখনো ও-রকম ছিল না।

তারপরে আমার দিকে ফিরে বলতে লাগল,—বাবুজী, অনেকদিন আপনার নিমক খেয়েছি, তাই বলছি, দোষ ধরবেন না। মেয়েটাকে

কিছুদিন পরে কিছু টাকা নিয়ে বিদায় করে দেবেন। সেদিন ডাক দেবেন বাহাদুরকে, বাহাদুর যেখানেই থাক, ঠিক এসে হাজির হবে আপনার কাছে। আপনার শাদীর ভাবনা কী বাবু? কলকাত্তায় গিয়ে ভালো দেখে শাদী করে আসবেন।

কথাগুলি ও বলে যাচ্ছে, আর আশ্চর্য, বসে বসে স-ব আমি স্থির হয়ে শুনে গেলাম। ওকে যে ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দেবো, এমন মনের জোরও খুঁজে পাচ্ছি না কেন? শুধু অনুভব করছি একটা অস্থিরতা—একটা অস্বস্তি! ও শেষ করা মাত্রই আবার উঠে দাঁড়ালাম। কোনক্রমে বললাম—আজ চলিরে বাহাদুর, বরং কাল একবার আসব।

উত্তর শোনবার জন্য আর অপেক্ষা করলাম না, দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এলাম ওদের ঘর থেকে। কথাটার প্রতিবাদও করতে পারছি না, অথচ কান পেতে কথাটা শুনতেও ভালো লাগছে না! উদ্দেশ্যবিহীন এদিক-ওদিক ঘুরে তারপরে বাড়ী ফিরে এলাম।

সে এক আশ্চর্য ফুলশয্যার রাত্রি নামল আমার ঘরে। কোথা থেকে ফুল জোগাড় করে এনেছিল কে জানে। মাথার কাছে একটা কাঁচের গ্লাসে তোড়া করে ফুল সাজানো। বিছানা পাতা। একপাশে দুটি মালা পড়ে আছে। সরস্বতী বললে—মালা কে গাঁথছে জানো? আমি। এই তোমারে একটা পরাইয়া দিলাম।

বলে, একটা মালা নিয়ে সত্যিই পরিয়ে দিলো আমার গলায়। তারপরে হাসি-হাসি মুখে বললে—ঐ মালাটা কী করবা? লক্ষ্মী আইলে লক্ষ্মীরে কাছে ডাইক্যা পরাইয়া দিও। আমি বিধবা মাইয়া, আমার এই ঘরে এখন বেশীক্ষণ থাকা উচিত না। ভালো কথা, খাইলা কেমন? বেবাক্ পাক করছে বইসা বইসা লক্ষ্মী। বড়ো ভালো মাইয়া। সাত চড়ে রাও করে না। ওরে কাছে ডাইকো, আদর কইরো, তোমারে খারাপ বউ দেয় নাই।

বললাম—তুমি যাচ্ছ কোথায়? থাকো না একটু?

আবার উন্মাদিনীর মতো খিলখিল করে হেসে উঠল। হাসতে-হাসতে ঘুরপাক খেতে লাগল ঘরের মধ্যে। বুকের আঁচলটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। হাসি থামিয়ে অদ্ভুতভাবে বলতে লাগল—বিধবা সাজাইয়াও বুঝি সাধ মেটে নাই। না-না বেশ আছি। লক্ষ্মীরে লইয়া তুমি সুখে থাকো, আমারে শুধু কানুরে আইন্যা দিও। আমি আর কিছু চাই না।

বলতে-বলতে দুহাতে মুখ ঢেকে হু-হু করে কান্নায় ভেঙে পড়ল সরস্বতী। বিব্রত বোধ করে ওকে থামাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত ওকে স্পর্শই করলাম আমি। দুটি হাত ওর কাধের ওপর রেখে বললাম—এ কী! কাঁদছ কেন, সরস্বতী?

—না-না, কাঁদব না, কাঁদব ক্যান?

বলতে বলতে আঁচলটা সামলে নিয়ে, আঁচল প্রান্তে চোখ মুছতে লাগল। মুছে, ঠোঁটের কোণে হাসি টেনে বলতে লাগল—বড়ো ভালো মানুষ গো তুমি, আমার কানুরে মানুষ কইরো। দুইটা ভাত যদি আমার কানু ঠিকমতো খাইতে পায়, দেখবা কতো শক্তি হয় ওর শরীরে, দেখবা কতো বুদ্ধি ওর মাথায়। আমারে কইত—হাকিম হবো মা। কানু হাকিম হইয়া ডাকাইতগুলারে খুব কইরা সাজা দিবো, তুমি দেইখ্যা লইও।

জানি না, যোগীন্দ্র মেয়ের কাণ্ড টের পেয়েছিল কি না, অথবা লক্ষ্মীই তার বাবাকে ডেকে দিয়েছিল, যোগীন্দ্র এসে একসময় ঘরে ঢুকল। বললে—আসো মা আসো, আমরা যাই। বাবুরে বিশ্রাম করিতে দাও।

সরস্বতী বাপের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকালো, তারপরে বললে—তুমি 'বাবু' কও ক্যান, তোমার জামাই না?

ম্লান একটু হাসল যোগীন্দ্র, তারপরে মেয়ের হাত ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললে—কিছু মনে করবেন না বাবু, ওরে ত জানেন, ওর মাথাটা আজও ঠিক হইল না।

বলে উঠলাম—কথাটা কিন্তু ঠিকই বলেছে। শ্বশুরই ত সম্পর্কে। আমার কিন্তু 'আপনি' করে কথা বলা উচিত।

যোগীন্দ্র লজ্জা পেয়ে বললে—কী যে বলেন বাবু।

বলে, মেয়ের হাত ধরে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আর তার কিছুক্ষণ পরেই দ্বিধাজড়িত পদক্ষেপে ঘরে এসে ঢুকল লক্ষ্মী। সোনালী জরির কাজ করা গোলাপী একটা শাড়ী পরনে, হাতে প্লাষ্টিকের চুড়ি, গলায় নকল সোনার সস্তা একছড়া হার।

বললাম—এতক্ষণে এলে, কম রাত হল নাকি ?

বড়ো-বড়ো চোখ দুটি তুলে তাকালো, তারপর বললো মৃদুকণ্ঠে—আপনি শুইয়া পড়েন, আমি বাতাস করি।

আমি মালাটা নিয়ে ঝুপ্ করে ওর গলায় পরিয়ে দিলাম। ও যেন লজ্জায় আরও জড়োসড়ো হয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি বসে পড়ল আমার পায়ের কাছে। দুটি পায়ের আঙ্গুলে কোমল হাত বুলিয়ে নিয়ে মাথায় ঠেকালো। তারপর গলার মালাটা খুলে রাখল আমার পায়ের ওপরে। সবিস্ময়ে বলে উঠলাম—এ কী করছ ! ওঠো।

উঠল না। আমি দু'হাতে ধরে ওকে তুললাম। দেখি চোখদুটি ভরে গেছে ওর জলে। বললাম—কাঁদছ কেন ?

কণ্ঠস্বরে বোধ হয় রুক্ষতা প্রকাশ পেয়ে থাকবে, তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে চোখ মুছে নিলে। বললাম—মালাটা খুলছ যে বড়ো ?

তাড়াতাড়ি বলে উঠল—না-না-মালা কেন ! আমার ভয় করে !

—কীসের ভয় ?

বললে—আপনি দেবতা—আপনি ব্রাহ্মণ—

অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠলাম—ঐ তেমাদের এক কথা ! ব্রাহ্মণতত্বটা দেখলে কোথায় ? এই পৈতেটা ? এখনি ছিঁড়ে ফেল্‌ছি।

তাড়াতাড়ি এসে আমার হাত চেপে ধরল, ভীত, ত্রস্ত কণ্ঠে বলে উঠল—সর্বনাশ করবেন না। সর্বশরীর ওর অজানা আতঙ্কে সত্যিই কাঁপছে থর-থর করে। দু'হাতে ধরে ওকে বসিয়ে দিলাম খাটের

উপরে। দেহটা এলিয়ে পড়ছে, তবু শোবে না, মনের জোরে শরীরটাকে সোজা রেখে ও বসে থাকবার চেষ্টা করতে লাগল। আমার গলার মালাটা খুলে ওর গলায় পরিয়ে দিলাম এবার জোর করে। ধমকের সুরে বললাম—ফের যদি কিছু বলো ত, ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে সারারাত বারান্দায় এই শীতের মধ্যে শুয়ে থাকব।

মুখ নীচু করে রইল।

ধীরে ধীরে গায়ের জামাটা খুললাম। বললাম—এটা আলনায় রেখে এসো ত? একটা কাজ পেয়ে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল লক্ষ্মী। জামাটা রেখে, এক গ্লাস জল গড়িয়ে নিয়ে এলো। জলটা খেয়ে গেলাসটা ওকে ফিরিয়ে দিতেই সেটা সে রেখে এলো যথাস্থানে। আমি ততক্ষণে বিছানায় এলিয়ে দিয়েছি নিজেকে। লক্ষ্মী ঘরের-কোণে দাঁড়িয়ে কী-সব এটা ওটা সেটা কাজ করছে কে জানে, বলে উঠলাম—দরজা বন্ধ করেছ? নিশ্চুপে এগিয়ে খিল তুলে দিলো দরজায়। খিল দিয়ে ঐখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

আদেশের সুরে বলে উঠলাম—ওখানে যে? এদিকে এসো।

পায়ে-পায়ে এসে দাঁড়ালো কাছে।

—বসো?

বসে পড়লো পায়ের কাছে।

—ওখানে না, এদিকে এসো।

আরও একটু সরে এলো আমার দিকে।

—এত ভয় কেন? আমি বাঘ না ভালুক?

মাথা নীচু করে চুপ করে আছে।

—পা দুটো তুলে ভাল করে বোসো না?

এ-ও আদেশের সুর। পা তুলে, হাঁটু মুড়ে মেয়েরা যেমন করে বসে, তেমনি করে বসে রইল নতমুখে। কিছুক্ষণ কথা নেই। ভারী ভালো লাগছিল ওর বসার ভঙ্গীটুকু, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম

চুপচাপ। একসময় বললাম তেমনি আদেশের সুরে,—মুখে কথা নেই কেন?

ভীরু চোখ দুটো আমার দিকে একবার তুলল, তুলেই নত করে ফেলল আবার। মৃদু কণ্ঠে বললে—মালাটা খুলে ফেলব?

—কেন?

কিছু বললে না। হাত বাড়িয়ে ওর একটা হাত টেনে নিলাম হাতের মধ্যে। বললাম—দিনরাত কাজ করে বেড়াও, হাত ত শক্ত নয়, দিব্যি নরম হাত।

লজ্জায় আরও নুয়ে পড়ল।

চাপা জ্যোৎস্না উঠেছে বাইরে, ঝি-ঝি হাওয়া বইছে, শীত-শীত ও করছে। ইভান্সের চিঠি না পাওয়ার উদ্বিগ্ন ভাবটা ভিতর থেকে জোর করে সরিয়ে ফেলে মনটাকে প্রফুল্ল করে তুলতে চাইলাম। সারাদিন যতো যা-ই করি, ও-চিন্তাটা যেন মনের মধ্যে সর্বক্ষণ কাঁটার মতো বিঁধে থাকে! যা হবার হোক, জীবনের এই রাত্রি ত আর ফিরে আসবে না।

বললাম—কী গো, বর পছন্দ হয়নি বুঝি বুড়ো বলে?

অস্ফুটকণ্ঠে বলে উঠল—ছি-ছি!

—কেন, ছি-ছি কেন?

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নীচু হয়ে আবার আমাকে প্রণাম করল।

বললাম—দেখ লক্ষ্মী, যা করবার আমি ভেবেচিন্তেই করেছি। স্ত্রী-হিসাবেই গ্রহণ করেছি তোমাকে। এটাকে দুদিনের খেলা বলে মনে কোরো না।

তেমনি মাথা নীচু ক'রে চুপচাপ বসে আছে।

এবারে একটু ব্যথিত কণ্ঠে বলে উঠলাম—কী, কথা বলবে না?

মালাটায় হাত দিয়ে তেমনি মৃদু কণ্ঠে বললে—এটা খুলি?

রাগত স্বরেই বলে উঠলাম—অস্বস্তি হচ্ছে বুঝি খুব?

ও বললে—আপনে পরেন না।

কথাটায় এমন একটা সুর ছিল, যা আমার মনে একটা খুশীর সুর উদ্বেল করে তুলল।

দুষ্টুমী করে বললাম—পরতে পারি একটা সর্তে।

ভীরু চোখ দুটি তুলে তাকালো। বললাম—তুমি নিজের হাতে পরিয়ে দেবে।

দুরন্ত লজ্জায় আবার মাথাটা নীচু করল লক্ষ্মী। আর তারপরে, ধীরে ধীরে খুলল মালাটা। খুলে একটু এগিয়ে এসে আমার গলায় পরিয়ে দিতেই—

দুটি হাতে একেবারে বুকের ওপর টেনে নিলাম ওকে। ত্রস্ত কণ্ঠে বলে উঠল—ছাড়েন-ছাড়েন!

বললাম—কেউ দেখছে না।

—আপনে ছাড়েন।

—ছাড়তে পারি, এবারেও এক সর্তে। 'তুমি' করে কথা বলো।

—যান।

বললাম—বিয়ের ঠিক আগে ত বলেছিলে। মনে নেই? সেই তোমার দিদির দিকে সাহেবটা যখন এগিয়ে গিয়েছিল?

ও আর নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল না, আমার বাহুবন্ধনে নিশ্চল হয়ে পড়ে রইল। ফিস্ ফিস্ করে বলে উঠলাম—কী হলো?

—কী?

বললাম—'তুমি' করে কথা বলার?

—কী বলব?

—শিখিয়ে দিতে হবে না কি?

—দিবেন না? আমি ত মুখ্যুসুখ্যু মানুষ।

বললাম—এই ত দিব্যি কথা বলতে পারো। সখটা মেটাবে না?

—কী সখ?

—ঐ যে বললাম। 'তুমি' করে বলতে?

—জানি না।

—তাহলে, আমিও ছাড়ব না।

—বাবারে বাবা।

—বুঝলে ত? আমি নাছোড়বান্দা। এবার বলো?

আমার বুকের ওপর মাথাটা রেখে বললে—আমি দোষ-টোষ করলে শুধ্‌রাইয়া দিবেন ত?

—কিন্তু, শুধরে নিচ্ছ কই? এই যে বললাম—

দুটি চোখ বুজে ফেলল। বললে—বড়ো ভয় করে।

—কাকে? আমাকে?

—না-না।

—তবে?

—যদি কোনো অন্যায় করে ফেলি? আপনি কতো বড়ো, আর আমি—

—ফের?

চোখ খুলল, বুক থেকে মাথা তুলে আমার চোখের দিকে সোজা তাকালো। ভীরু নয়, দৃপ্ত দুটি চোখ। আর, বুকখানা উত্তেজনায় সজোরে ওঠা-নামা করেছে। দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা চেপে রইল কয়েক মুহূর্ত, তারপরে বললে—বীরপুরুষ আপনি, বিয়া করতে গেলেন ক্যান?

একটু অবাকই হলাম ওর ধরণ দেখে। বললাম—মানে?

ও বললে—বিয়া করনের কী দরকার ছিল? আপনি বাবুলোক, আমারে এমনি রাখলেই ত হইত।

উঠে বসলাম, বললাম—কেন?

বললে—আমরা ভিখারী মানুষ, আমাদের আশা তার বেশী কী কইরা হইব? অথচ, কী যে কইরা ফেলাইলেন আপনে! আমার মাথাটাথা বুঝি খারাপই হইয়া যাইব।

গম্ভীর কণ্ঠে বললাম—তোমার নয়, তোমাদের ও-ধরণের কথা

শুনতে শুনতে আমারই মাথা খারাপ হয়ে যাবে। ভাবো কী আমাকে? আমি রক্ষিতা রাখব তোমাকে?

ক্ষতি কী। আমরা ত রাজীই ছিলাম।

বললাম—কিন্তু, আমার বিবেক সে কথা শুনবে কেন?

—শুনবে-শুনবে। আর দুইটা দিন যাউক, ঠিক বুঝবেন, ভুলই আপনে করছেন।

ওকে দুহাতে টেনে নিলাম সজোরে। বললাম—না-না কোনো ভুল আমি করিনি। আর কোনোদিন বলবে না এমন কথা। বুঝলে?

লক্ষ্মী বললে—আঃ। ছাড়ো-ছাড়ো—লাগে।

ছেড়ে দিলাম। কিন্তু ওর মুখের ঐ অতর্কিত 'তুমি' করে সম্ভাষণ, মুহূর্তে যেন মধুবর্ষণ করল।

অভিভূত হয়ে ডাকলাম, লক্ষ্মী?

ও মাথা লুটিয়ে পড়ে গিয়েছিল বিছানার ওপরে। সেইভাবে থেকেই মৃদু কণ্ঠে বললে—কী?

ওর পাশে হাতের কনুই ভর দিয়ে শুয়ে পড়লাম। বললাম—খুব ভালো লাগছে, জানো?

মৃদু একটু হাসল, বললে—রাত অনেক হইল কিন্তু। ঘুমাবে না?

—না। সারারাত জাগব।

চুপ করে রইল। বললাম—আমার এক বোন ছিল, খুব ভালবাসত আমাকে, মারা গেছে। তার বড়ো সখ ছিল আমার বিয়ে দেবার। সে যদি থাকত, তাহলে খুব খুসী হতো।

ও বললে—বইনের কথা কও, আমি শুনি।

মনের এক রুদ্ধ দুয়ার যেন খুলে গেছে। অতসীর সব কথা ইনিয়ে বিনিয়ে ওর কাছে বলতে লাগলাম।

সেই যে ওর বড়োলোক বান্ধবীকে আমাদের বাড়ী নিয়ে এলো, আমার সঙ্গে তার বিয়ে দেবার কতোই না ইচ্ছা ছিল। কিন্তু, তার সেই ছেলেমানুষীকে সংসার মূল্য দেবে কেন?

গল্প করতে করতে ভোর রাত্রের দিকে বোধহয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রাত ফর্সা হয়ে আসছে, বাইরে পাখী ডাকছে, দেখি, উঠে বসেছে লক্ষ্মী, এলানো খোঁপাটা ঠিক করল,আঁচলটা গুছিয়ে নিলে, ঘোমটাটা টেনে দিলো মাথায়। তারপরে খাট থেকে নেমে দাঁড়িয়ে গলায় আঁচল জড়িয়ে আমার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে, তারপরে চলে গেল।

দেখলাম সব, বুঝলাম' সব, কিছু বললাম না। আবার সেই অস্বস্তির কাঁটা মনের কোণে ফুটে ফুটে উঠছে। কদিন আর এই স্বর্গ-রাজ্য-সম্ভোগ ?

বোধহয় আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। জেগে যখন উঠলাম, তখন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি, আট-টা বেজে গেছে। একটু পরেই বাথরুম থেকে ঘুরে এসে দেখি, লক্ষ্মী ঘরে ঢুকছে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে।

ডুরে একটা খয়েরী রঙের শাড়ী পরেছে, স্নান করেছে, মাথার চুল পিঠের ওপর এলিয়ে আছে, এখনো শুকোয়নি।

বললাম—বাপ কোথায় ?

—বাজারে গেছে।

—সরস্বতী ?

—রান্নাঘরে। ডাকব ?

—না, তার দরকার নেই। তুমি কাছে এসো।

—ক্যান ?

—বারে, বসবে না একটু কাছে ?

—কাজকর্ম আছে না ?

রাগ করে বললাম—কাজকর্ম করবার লোক আজই ঠিক করছি। তুমি আমার বউ, রাঁধুনী নও।

লক্ষ্মী বললে—রাঁধুনীরে বউ বানাইলেই কি সে চট কইরা বউ হইতে পারে?

বলেই চলে যাচ্ছিল, পিছন থেকে তীক্ষ্ণকণ্ঠে ডেকে উঠলাম—লক্ষ্মী?

থমকে দাঁড়ালো। বলে উঠলাম—চা খাবো না কিন্তু কাছে না এলে।

অগত্যা কাছে এসে দাঁড়ালো। ওর হাত ধরে আরও কাছে টেনে নিলাম ওকে। বললাম—চা খেয়েছ?

চুপ করে রইল।

—খাওনি বুঝি? এসো একসঙ্গে খাই।

—ছি-ছি।

—ছি-ছি কী! স্বামী-স্ত্রী না আমরা?

—দিদি কি মনে করবে?

—কিছু মনে করবে না।

—বারে, পাকঘর থিকা চায়ের কাপ আনলেই ত ঠাট্টা করব।

বললাম—পাকঘরে যেতে হবে কেন? এই ত কাপ রয়েছে। এসো দুজনে খাই।

যেন বিষাক্ত সাপের উদ্যত ফণা দেখেছে সামনে। এমনি আতঙ্কে দু-পা পিছিয়ে গিয়ে বললে—সর্বনাশ!

—কীসের সর্বনাশ

—পাপ হইব না?

—কীসের পাপ?

বললে—আমারে কাইটা ফ্যালাইলেও আমার মুখেরটা তোমারে দিতে পারুম না।

—কেন?

—ছি-ছি—অমন কথা কয়ো না।

আদেশের সুরে বললাম—তোমাকে খেতেই হবে। তুমি আগে একটু খাবে, তারপরে আমি খাবো।

—ঐ এক কাপ থিকা ?

—হ্যাঁ।

লক্ষ্মী একেবারে কেঁদেই ফেলল। বলল—এমন সাজা আমারে দিও না তুমি।

ওকে কাছে টেনে নিয়ে সান্ত্বনা দিতে দিতে বললাম—কিসের সংস্কার তোমার ? সমাজটা ত ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। কাকে ভয় তোমার ?

কান্না থামিয়ে ও একটু অবাক হয়েই আমার মুখের দিকে তাকালো। বেশ বুঝতে পারলাম আমার কথা ও বোঝেনি। কণ্ঠস্বর একটু উচ্চে তুলে অসহিষ্ণু কণ্ঠেই বলে উঠলাম—শেষ পর্যন্ত ঠাণ্ডা চা-টা মুখে তুলব নাকি ?

সন্ত্রস্ত হয়ে বলে উঠল—না না, আমি এখুনি গরম চা আইন্যা দিতাছি।

বললাম—চা এখনো গরম আছে। আগে তুমি চুমুক দিয়ে খাও।

নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে দেখে ধমক দিয়েই বললাম—মুখে দাও শীগ্‌গির ?

ঠিক এই সময়ে ঘরে ঢুকল সরস্বতী, বললে—কী হইতেছে ? এত চিকৈর ক্যান্‌ ?

বললাম—এই যে এসো। এক কাপ থেকে চা খেতে চাই দুজনে, তা ও কিছুতেই খাবে না।

লক্ষ্মী আরও লজ্জা পেয়ে বলে উঠল—ছি-ছি।

—ঐ দেখ, 'ছি-ছি' করছে।

হাসতে-হাসতে এগিয়ে এলো সরস্বতী। এসে করল কী, চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে নিজেই এক চুমুক খেলো, তারপরে আমার মুখের কাছে ধরে বললে—খাও।

লক্ষ্মী বিস্ফারিত নেত্রে বোনের কাণ্ড দেখছে, সরস্বতীর কোনো দ্বিধা নেই, সংকোচও নেই। আমি একবার ওদের দুজনের দিকে

তাকিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে চুমুক দিয়ে চায়ের বাকীটুকু শেষ করে ফেললাম। ফেলে, কাপটা টেবিলের ওপরে রেখেছি, এমন সময় ঘটল অভাবনীয় ব্যাপার। লক্ষ্মী হঠাৎ তার দিদিকে টেনে নিলো হাত ধরে, উত্তেজনায় থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে সে। বললে—করলি কী তুই। তোর আইঠাটা খাইতে দিলি? ও বামুন না?

মুখ টিপে-টিপে হাসতে লাগল সরস্বতী। লক্ষ্মীর রাগ বুঝি আরও বেড়ে গেল, বললে—তোর সর্বনাশ হবে!

সরস্বতী বললে—তোর সর্বনাশের আথায় আমি ছাই দিছি। ও যদি বামুন হয়, আমিই বা বামুন নয় ক্যান্? আমার কানুই বা বামুন নয় ক্যান?

বলতে বলতে সরস্বতী লক্ষ্মীর দুটি কাঁধ ধরল শক্ত করে, বলতে লাগল—ওরে হতচ্ছাড়ী মুখপুড়ী, লোকটা কে? আমার কানুরই ত বাপ, আমি বিধবা সাইজ্যা অরে মুক্তি দিছি বইলাই ত তুই পালি। নইলে, পাইতিস?

তারপরেই ঘুরে দাঁড়িয়ে ওকে ঠেলা দিয়ে ফেলে দিলে আমার গায়ের ওপরে, বললে—যা-যা, সোয়ামীর কোলে গিয়া বস্, নছল্যা দেখ ছ্যাম্‌রীর!

বলে, দুম্‌দাম পা ফেলে হনহন করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। কিন্তু যা রেখে গেল, তা হচ্ছে অভাবনীয় বিস্ময়। লক্ষ্মী কী ভাবছিল জানি না, আমার মনটা চম্‌কে উঠলেও পরমুহূর্তেই ভরে গেল করুণায়।

আসল কথা, সরস্বতীর মনটা আজকাল অনেক সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে এলেও মাঝে মাঝে কেমন যেন সূত্রবিহীন হয়ে যায়। না হলে আমার সম্বন্ধে এমন ভাবে অসতর্ক উক্তিই বা ও করে বসবে কেন?

আবার সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে হয়, এমন অসংলগ্ন অভিব্যক্তির পিছনে কোনো সত্যও কি লুকিয়ে নেই? আমাকে ওর যে ভালো

লেগেছে, সেই ভালো-লাগার মধ্য দিয়ে কোনো মাধুর্যের বিকীরণ কি ঘট্‌ছে না? হয়ত বা নিছক স্নেহ, হয়ত বা অন্য-কিছু, এবং সে 'অন্য-কিছু'র সন্ধান পাগলিনী জানেই না।

সন্ধার কুলায় ফিরে এসে পাখী ডাকে, তারপরে সন্ধ্যা নেমে আসে গাঢ়তর হয়ে, আবার রাত্রি ভোর হয়, সূর্য ওঠে। এইভাবে দিন যায়, কিন্তু অবাক হয়ে রোজই যে-কথা ভাবি সে হচ্ছে ইভান্সের চিঠি এখনো এলো না কেন?

অবশেষে থাকতে না পেরে নিজেই একদিন চিঠি দিলাম ইভান্সকে। লিখলাম—আশা করি ভালো আছো। সে রাত্রের ঐ ঘটনার জন্য লজ্জিত। দুটি বোনের মধ্যে, ছোটটিকে বিয়ে করেছি।

উত্তর অবশ্য এলো। সংক্ষিপ্তই সে উত্তর। লিখেছে—সব জানি। ব্যস্ত আছি। বাজার মন্দা চলেছে। মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ চলেছে পত্রের মাধ্যমে। ব্যবসা খানিকটা গুটিয়ে ফেলা হবে কিনা, সে-নিয়ে চিন্তার বিনিময় চল্‌ছে।

বিবাহ রাত্রি থেকে এই রকম সুরই ত আশা করে আস্‌ছি। লিখলাম—স্বস্তি পেলাম। প্রতি মুহূর্তেই 'চাকরী নেই'—সম্বলিত পত্র এসে পড়বে আশঙ্কা-করছিলাম। ইঙ্গিতটা ধরতে পেরেছি। মাসখানেক সময় দাও, কাজ খুঁজে নিয়ে চলে যাবো।

ইভান্স এবার উত্তর দিলো সঙ্গে সঙ্গেই। লিখলে—ব্যবসা গুটানোর অর্থ তোমাকে বরখাস্ত করা নয়। নিশ্চিত থেকো, চাকরী তোমার যাবে না, তবে বদলী হতে পারো।

বদলী!...

চুপচাপ বসে ভাবছিলাম। ইভান্সের এ যে এক নিগূঢ় ছলনা, এ যেন বেশ বুঝতে পারছি। বোধহয় দার্জিলিং বা কালিম্পঙ বা ঐ ধরনের কোনো জায়গায় আমাকে ও পাঠাতে চায়। চাষ-বাস-করা লোক নিয়ে আমার কারবার, সুতরাং ইচ্ছা না থাকলেও রাজনৈতিক

আবর্তের মধ্যে গিয়ে পড়তে হবে। সাধারণ লোক ক্ষেপে গেলেই হলো, তখন কাছের লোকটার ওপর প্রথম আঘাতটা এসে পড়ে। কিন্তু, লক্ষ্মী-সরস্বতীর কী হবে? কী যে ওদের ভাগ্য, দেশের ঘূর্ণাবর্তের বিষ যেন ওদেরই ওপর এসে ছায়া ফেলতে চায় বারংবার।

যোগীন্দ্র এসে একদিন বললে—বাবু, একটা কথা ছিল।

টেবিলে বসে অফিসেরই কাজ করছিলাম, বললাম—কী?

বললে—সরস্বতী আপনারে খুব বিরক্ত করে, না?

একটু চমকেই উঠলাম বলা যায়, বলে উঠলাম—কে বললে? লক্ষ্মী?

—না-না!—যোগীন্দ্র বললে—লক্ষ্মী আমার লক্ষ্মী মাইয়া, দিদির উপর ওর কোনরকম রীষ নাই।

—তবে এ কথা উঠছে কেন?

যোগীন্দ্র বললে—সরস্বতীর ত মাথা ঠিক নাই, কখন কী কইরা বসে, আপনি কাজকর্ম নিয়ে থাকেন, আমি ডরে মরি।

বললাম—আমি একটু গুছিয়ে নিই, তারপর ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা করব।

যোগীন্দ্রর মুখখানা যেন আরও ম্লান হয়ে গেল, কুণ্ঠিত স্বরে বললে—আপনার উপরে কতো আর চাপ দিতে পারি। আপনি দেবতার লাখান মানুষ, লক্ষ্মীরে যে পায়ে রাখছেন, এইতেই আমরা বাইচ্যা গেছি। নইলে কোন মাতাল-দাতালের হাতে গিয়া পড়ত কে জানে।

দুঃখিত হয়ে বললাম—ও-কথা আবার কেন?

যোগীন্দ্র বললে—আপনি অনুমতি করেন বাবু, সরস্বতীকে নিয়া আমি কোথাও চইলা যাই।

চম্‌কে উঠলাম মুহূর্তে। হাতের কলমটা কেঁপে গেল। বললাম, সে কী! কেন?

ও বললে—ভাইবেন না, বাপ-বেটির দিন ঠিকই চইলা যাইব। আমরা বাঁশ কাইট্যা ঝুড়ি বানামু।

বলে উঠলাম—আচ্ছা, আমার একটা কথা এবার তাহলে বলি। ধরা যাক, যদি আমারই চাকরী চলে যায়? সেই সাহেবর কথা মনে আছে ত। তার ঘরেই ত আমার চাকরী? রাগ তার পড়েনি, পড়বেও না! যদি চাকরী থেকে ছাড়িয়ে দেয়?

—আর চাকরী পাইবেন না?

—খুব শক্ত।

যোগীন্দ্র চুপ করে দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবতে লাগল।

বললাম—সেদিন আমরা সবাই ত গিয়ে একসঙ্গে পথে দাঁড়াবো? সেদিন কি আমাকে একেবারে আপন বলে মনে হবে না?

যোগীন্দ্রের চোখে ফুটে উঠল বিস্ময়, একটু ব্যথিতও বুঝি হলো সে। বললে—আপন বলে কি আপনারে মনে করি না বাবু?

সোজা হয়ে বসলাম চেয়ারে, ওর চোখের দিকে তাকালাম সরাসরি। বললাম—সত্যিই কি তা' মনে করো? এই কদিনে আমি কী দেখলাম জানো? তুমি আমাকে এখনো ভাবো 'মনিব' বলে। লক্ষ্মী আমাকে—

একটু থেমে, একটু দম নিয়ে বললাম—লক্ষ্মী আমাকে ঠিক স্বামী হিসাবে ভাবতে পারে না। কিন্তু যাকে তোমরা পাগল বলো, সেই সরস্বতীই একমাত্র আমাকে আপন বলে ভাবে। নিজের জাত, নিজের লোক বলে ভাবে। জাতের আড়াল সে অনায়াসেই ভেঙে দিতে পেরেছে।

যোগীন্দ্র মন দিয়েই শুনছিল আমার কথা। বললে—লক্ষ্মী আপনার বাধ্য হয় না বাবু? আপনার কথা শোনে না?

কী কথায় কী উত্তর! মূল প্রশ্ন কৌশলে যেন এড়িয়ে যেতে চায় যোগীন্দ্র। বললাম—আমার খুব বাধ্য। কথা খুবই শোনে, খুবই করে আমার সেবা। কিন্তু, সবই করে আমার মাইনে করা চাকরাণীর মতো। সে আমার স্ত্রী, চাকরাণী বা রাঁধুনী নয়।

কথার উত্তর দিতে গিয়ে যোগীন্দ্রের গলা যেন একটু ধরে এলো।

বললে—আপনারে সে দেবতার মতো দেখে বাবু, তার ওপর রাগ করবেন না।

রাগত স্বরেই বলে উঠলাম—কিন্তু আমি দেবতা হতে চাইনি, আমি তার স্বামী হতে চেয়েছি—রক্ত মাংসের মানুষ।

যোগীন্দ্র বললে—বাবু, আপনার দয়া মায়ার শরীল, স্ত্রী কইতেছেন সে আপনার দয়া। কিন্তু সে কি নিজেরে আপনার স্ত্রী সত্যিই মনে করতে পারে?

—বল্‌ছ কী। বলে উঠলাম, বিয়ে করেছি না তাকে?

যোগীন্দ্র বললে—সে-ও আপনার দয়া। বিয়ার বন্দোবস্ত কইরে সমাজের মুখ বন্ধ করেছেন, আমারও মান বাঁচাইছেন। কিন্তু, সে-ও ত মানুষ বাবু, সে কী কইরে নিজেরে অমন কইরা ভাবব? কার মাইয়া সে? ভিখারীর মাইয়া। মুখ্যুসুখ্যু গরীব মাইন্‌সের মাইয়া। আমি বলি, এই সব ভাবনা আপনি করবেন না। ও আপনার আজীবন যত্ন করব, সেবা করব। আমি উয়ার বাবা হইয়া কইতেছি, আপনি পরে ভালো লেখাপড়ি-জানা মাইয়া দেইখ্যা বিয়া করবেন।

তর্কটা অতি অদ্ভুত। রাগ আর বিরক্তি আমাকে অধিকার করে বসল ওর কথা শুনতে শুনতে। ইচ্ছা হলো অতি রূঢ় আর কঠিন কথা বলে ওকে আগাগোড়া আঘাতে-আঘাতে জর্জরিত করে তুলি। ওর সিদ্ধান্তের মূলে যেন আমারই মনের নিগূঢ় অংশের কোনো নীচতা আর হীনতা অতি বীভৎসরূপেই আত্মপ্রকাশ করছে। ওর সিদ্ধান্ত সব আমারই অর্দ্ধচেতন মনের বহিঃপ্রকাশ, যার সত্যতা ক্ষীণভাবে উপলব্ধি করলেও মূর্ত প্রকাশ সহ্য করারও অতীত হয়ে পড়েছে।

দুহাতে মাথার দুটো রগ চেপে ধরে চেয়ারে এলিয়ে দিলাম নিজেকে। কোনক্রমে বলে উঠলাম, আর না—তুমি যাও—তুমি যাও যোগীন্দ্র।

তবুও গেল না, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল অশরীর ছায়ার মতো।

কিছুক্ষণ নির্বাক নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকবার পর একসময় ও কথা বলল। বললে—সব ঠিক হইয়া যাইব বাবু, আমারে শুধু বিদায় দেন।

চীৎকার করে উঠলাম—হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই যাও তুমি।

আবার এক মুহূর্ত চুপচাপ। ও বললে—কালই সকালে যাই তাহলে, বাবু?

জ্বলে উঠে বললাম—এতো করে অনুমতিই বা চাইছ কেন? তোমাদের কি আমি হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখে দিয়েছি? কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারি কী, যাবে কোথায়? চা-বাগানের সেই লোকটি আবার এসেছিল কী? তার হাতে ঐ সরস্বতীকে তুলে দিতে চাও বুঝি?

বিবর্ণ হয়ে গেল যোগীন্দ্রর মুখ, বলল—না বাবু, না। আপনের সুখ—আপনের শান্তির জন্যই চইলা যাইতে চাইতেছি।

—কী বললে! আমার সুখ—আমার শান্তি! খুব বোঝো আমার শান্তির কথা। তীব্র কণ্ঠে বলে উঠলাম—তা যদি বুঝতে ত, এমন করে চলে যেতে চাইতে না।

যোগীন্দ্র মাথা নীচু করে থেকে ব্যথাতুর মুখখানা তুলে আবার তাকালো, বললে—বাবু, মাইয়ার ভালো কোন্ বাপে না চায়। মাইয়ার ভালো চাই বইলাই চইলা যাইতে চাইতেছি। এখন আপনে যা চাইবেন তাই হইব।

আমার কণ্ঠস্বর বেশ উঁচুতেই উঠেছিল; এবং সেই স্বর লক্ষ্মীর কানে অন্ততঃ নিশ্চয়ই পৌঁছে থাকবে। সেই জন্য প্রতি মুহূর্তেই আশা করছিলাম, সে এসে পড়বে ঘরে! বাপ চলে যেতে চায় শুনে বাপের পায়ের ওপর কেঁদে পড়ে তার পথ আটকাবে ধরে!

কিন্তু, লক্ষ্মীকে আমি কমই চিনেছি। নিজের মনের আবেগ আর বেদনার সুর সবই চেপে রেখে সে দাসীর আত্মনিবেদনের মধ্যে সব-কিছু ডুবিয়ে দিয়ে বসে আছে।

না, সে এলো না, এল সরস্বতী। কিছু একটা হয়েছে আন্দাজ

করেই সে বলে উঠল আমাকে,—কী হইল গো তোমার? খেইপা গেলে ক্যান? শ্বশুরের সঙ্গে বুঝি অমন করে কথা কয়? ছি-ছি!

বলে উঠলাম—কথাটা তোমার বাপকেই শোনাও সরস্বতী। শ্বশুর হয়ে নিজের জামাইকে যে 'আপনি-আজ্ঞে' করে কথা বলে, তাকে তুমি কি ভাবতে পারো?

যোগীন্দ্র কথার কোন উত্তরই দিলো না, ধীরে ধীরে প্রস্থান করল ঘর থেকে। আর সরস্বতী করল কী, হঠাৎ ছুটে এসে আমার চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে দুটি হাত আমার গলায় দিলো মালার মতো ঝুলিয়ে। বললে—পোলাপানের লাখান রাগরঙ্গ করো ক্যান? কী হইছে কও দেখি?

সত্যি কথা বলতে কী, ওর এই অন্তরঙ্গ ব্যবহারই আমকে মুহূর্তে সহজ করে তুলল। বললাম—তোমার বাপ তোমাকে নিয়ে চলে যেতে চাইছে, তা জানো?

সরস্বতী বললে—জানি। আমারে ত সকালেই কইলো, গাঁটরী-বোঁচকা বাঁধ, আমরা চইলা যাই। আমি ত মনে মনে হাসলাম। বাবায় যাইব, তাইলেই হইছে। আমাগো ফেইল্যা যাইব কেমন কইরা?

—তোমাকে যে বললে নিয়ে যাবে সঙ্গে?

—ঈস্! ঠোঁট উল্‌টে সরস্বতী বললে—আমি তোমারে ফেলাইয়া যামু আর কী, যামু ক্যান?

বলে উঠলাম—আমি তোমার কে সরস্বতী?

—কে? সরস্বতী বললে—খুব আপনজন!

—তবু?

—ঐ যে কইলাম আপনজন!—বলেই কী যেন একটু ভাবল, তারপরে বললে—বাপরে বাপ, আর আমি কিছু কইতে পারি না!

বললাম—জাতে আমরা এক নই।

হেসে উঠল খিলখিল করে, বললে—কী কইলা! জাত-জাত করো

যে হঠাৎ? দুনিয়ায় ভিন্‌জাতের কেউ আছে নাকি? সবাই ত একজাত।

—মানে?

পাগল বলে—সবাই মায়ের কোলে আসে, সবাই মায়ের বুকের দুধ খাইয়া বড়ো হয়, ইস্কুলে যায়, তারপরে বাইরে যায় বড়ো ইস্কুলে পড়তে মায়রে ছাইরা। জাত আবার কী? সবাই আমার কানুর লাখান। সবাই একজাত।

কথার মধ্যে হয়ত অসঙ্গতি আছে, কিন্তু অদ্ভুত একটা ভাবও আছে। এবং আছে বলেই ওর সঙ্গে কথা বলে মনের ভাবটা লাঘব করা যায়।

ও বলে—কী ভাবো গো? লক্ষ্মীরে ডাকুম নাকি?

—কেন?

—আইস্যা তোমার সঙ্গে বইসা বইসা গল্প করুক।

বললাম—তুমি কী করবে?

বললে—বাপের কাছে গিয়া একটু বসি। বোঝো না, বাপের মনটা দুখায়। বলতে বলতে সরে গেল কাছ থেকে। দরজার কাছে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে, মাথা হেলিয়ে হাসি-হাসি মুখে বলে,—আসি কেমন?

চলে যায়। এবং বোধ হয় ও-ই গিয়ে জোর করে পাঠিয়ে দেয় লক্ষ্মীকে। মনটা অনেক হালকা হয়ে গিয়েছিল।

বললাম—এসো গো।

—ডাকলেন ক্যান?

তিরস্কারের সুরে বলে উঠলাম—আবার 'ডাকলেন'? কাছে এসো বল্‌ছি।

এলো। হাত ধরে টেনে নিলাম আরও কাছে। বললাম—লোক রাখতে চাইছি, কিছুতেই রাজী হচ্ছো না তুমি। আমার কি ইচ্ছা করে না তোমার সঙ্গে বসে গল্প করতে? কতটুকু পাই তোমাকে,বলো?

লক্ষ্মী গাঢ় কণ্ঠে বললে—আমি ত আছিই। ডাকলেই পারেন?

—সব-সময়ই ডাকডাকি করতে হবে? নিজে থেকে আসতে পারো না?

চুপ করে রইল। বললাম—দেখ, আমি তোমার কোন কথা শুনব না, আমি এখুনি বেরুচ্ছি। বাহাদুরের মতো কাজ করার লোক সঙ্গে করে নিয়ে আসবই।

তা-ই করেছিলাম। বাহাদুরদের আস্তানা থেকেই একটা ছেলে পাওয়া গেল বারো-তেরো বছর বয়সের। তাকে একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে এলাম। বললাম—দেখ লক্ষ্মী, বাজার-টাজার সব ও-করবে, ফাইফরমাশ খাটবে, তোমার বাপকে তুমি এরপর আর একেবারেই খাটাবে না।

লক্ষ্মী কোনো উত্তর করল না, মাথাটা একটু হেলিয়ে শুধু নীরবেই জানালো—আচ্ছা।

বললাম—রান্নার লোকও আমি পাবো দু-একদিনের মধ্যে।

এবারে কিছু বললো না লক্ষ্মী। কিন্তু, যে বলল সে সরস্বতী। একটু পরেই ছুটে এলো ঘরে, এসে বলল—এইটা কী করলা তুমি? চারটা ত প্রাণী মোটে, তার জন্য আবার রাঁধুনী চাকর ক্যান?

বললাম—বোন গিয়ে নালিশ করেছে বুঝি?

বললে—নালিশ ক্যান? কান্‌তেছে রান্নাঘরে।

লক্ষ্মী কাঁদছে! যাক, পাষণ চোখে অশ্রু আছে তা হলে! কথাটা শুনে কী-এক অদ্ভুত তৃপ্তি পেলাম মনে মনে।

বললাম—না ডাকলে ত সে আসবে না! একটু ডেকে দাও ত এখখুনি।

বললে—ছি ছি!

বলে, চলে যেতে যেতে আবার ফিরল, বললে—চাকর রাখছ, মন্দ না। বাপেরে আর খাটাই না আমরা, কিন্তু রান্নার লোক আর রাইখো না। আমরা আছি কি করতে দুই বোনে?

ও চলে যাবার একটু পরেই লক্ষ্মী এলো ঘরে তার অভ্যস্ত ধীর পদক্ষেপে। উঠে গিয়ে ওকে সস্নেহে একেবারে কাছে টেনে নিলাম দুই হাতে। বললাম, কাঁদছিলে শুনলাম? কেন?

মুখখানি নীচু করে চোখের জল সামলাতে লাগল। বললাম—ঐ দেখ! আবার?

অশ্রু ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলে উঠল—এত খরচ বাড়াইতেছ ক্যান তুমি?

একে ত স্বচ্ছন্দে 'তুমি' সম্বোধনে কথা, তার ওপরে ওর গলার স্বরে এমন একটা কিছু ছিল, আমার মনে হলো, যেন বিবাহপর্ব থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এত আনন্দ আর কখনো পাইনি! আমার উচ্ছ্বাস সেই মুহূর্তে স্বভাবতই মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ও তাড়াতাড়ি নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো সন্ত্রস্ত হয়ে; বললে—যাও, কী করো। দিদি রইছে না?

—দিদি ত ঘরে নেই?

—কাছেই ত রইছে।

মনটা সত্যিই লঘু হয়ে গেছে। বললাম—লক্ষ্মী, একটা কথা তোমাকে বলবার আছে।

ঈষৎ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করল—কী?

ওর হাত ধরে খাটের ওপর নিয়ে এলাম। বসলাম দুজনে পাশাপাশি। বললাম—দেখ, আমার এই চাকরীটাই সম্বল, জমানো কিছু নেই। চাকরী যদি যায়?

চোখ দুটো বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

বললাম—তখন তোমারাও যা আমিও তাই। তুমি তবু রান্না-বান্নার কাজ জানো, আমি তা-ও জানি না। তোমার বাবা ঝুড়ি বুনবার কাজ জানে, আমি তা-ও জানি না।

বললে—আহা! কী যে সব কথা কও!

বললাম—খুব বাজে কথা বলিনি, মনটা খুব উদ্বিগ্ন হয়ে আছে।

কী জানো ? আমার কেউ কোথাও নেই। যারা আছে তাদের সঙ্গে সংযোগও নেই। নিজেকে নিয়েই আমার সব। এবার তোমরা এসেছ, তোমাদের নিয়েই হেসেখেলে থাকতে চাই। এ-অবস্থায় তুমি যদি দূরে দূরে থাকো, আর তোমার বাবা যদি যাই-যাই করে, তাহলে আমার মনের ভাব কেমন হয় বলো ত ?

সমস্ত মনপ্রাণ দিয়েই বুঝি শুনছিল আমার কথা। আমি শেষ করতেই ও যেন খানিকটা অপ্রাসঙ্গিকভাবেই বলে উঠল—তুমি এতো বড়ো মানুষ কেমন কইরা হইলা !

বলে উঠলাম—বড়ো মানুষটা কোথায় দেখছ ? তোমাদের মনের ঐভাব আর গেল না। নিজেকে তুমি এখনো আমার 'রক্ষিতা' ভবো, স্ত্রী ভাবো না। অগ্নিসাক্ষী করে বিবাহ, এ-তুমি অস্বীকার করতে পারো ? কী, উত্তর দিচ্ছ না যে ?

লক্ষ্মীর কণ্ঠস্বরে প্রকাশ পেলো ঈষৎ তীব্রতার আভাস। ও বলে উঠল—আমি যদি সে কথা ভাইবাই মনে একটু সন্তোষ পাই, তুমি সেই লইয়া অতো রাগরঙ্গ করো ক্যান, শুনি ?

—কিন্তু, কেন ভাববে তুমি নিজেকে ঐরকম ? এর পিছনে কী যুক্তি আছে ?

নির্বাক হয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপরে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল—দিদিরে ডাইক্যা দেই।

খপ করে হাত ধরে ফেললাম ওর। বললাম—এর মানেটা কী ? কথায় কথায় দিদিরে ডাইক্যা দেই। আমি কি দিদিকে বিয়ে করেছি নাকি ?

মুখ টিপে লক্ষ্মী একটু হাসল, বললে—সখ ত ছিল।

দুই হাতে ওকে বন্দিনী করে ফেললাম মুহূর্তে। আমার নিরুদ্ধ যৌবন যেন দাবী জানাতে চায় তার জীবনের কাছে। বিচিত্র এক দাবী। আর বলতে চায়, চল্লিশোত্তর জীবনে এ পাওয়াকে রমণীয় করে তুলতে চাই, একথাও যেমন সত্য, তেমন সত্য নিঃসঙ্গ জীবনে

প্রতিদিনের প্রতিমুহূর্তের সঙ্গিনী চাই—সুষমামণ্ডিত তরুণ এক নারীদেহ, তা সে সমাজগতভাবে যে বর্ণেরই হোক না কেন, যে জাতেরই হোক কেন।

যোগীন্দ্র যেন পরিস্থিতির সঙ্গে ধীরে ধীরে মানিয়ে নিতে লাগল নিজেকে। সে তার ঘরের মধ্যে বসে ঝুড়ি বোনে, বাজারে গিয়ে বিক্রী করে আসে, আর সেই টাকা এনে দেয় ছোট মেয়ের কাছে। বলে বাক্সের মধ্যে জমাইয়া রাখ।

ডেকে একদিন বলি—নিজের উপার্জন মেয়েকে দাও কেন?

ম্লান একটু হেসে বললে—ওরে দিবো না ত কারে দিবো, বাবু। ঐ মাইয়ার ত মাথার ঠিক নাই, আমি ত আজ আছি কাল নাই। থাকুক অর কাছে, ও-ই ত আমার সব, ও-ই আমার লক্ষ্মী, ও ছিল বইলাই ত আপনেরে পাইছি।

অভিমান করে বললাম—আমাকে পেয়েছ এটা তোমার মুখের কথা। আপন করে নিতে পারো নি।

যোগীন্দ্র বললো—বাবু বার বার কথাটা কইয়া আমারে লজ্জা দিতেছেন। মুখের কথাটা না ধইরা মনের কথাটা ধরেন। বাবু, নিজেরে আপনি সমাজের বাইরের লোক বইলা ভাবেন, তাই ভুলটা হইতেছে। আপনে আমার মাইয়ারে নিছেন বইলাই কি আমি সত্যসত্য আপনার শ্বশুর হইয়া গেলাম? নিজেরে সেইটা ভাবি কী কইরা? আমি যুগী, আপনে বামুন। বাপ-দাদার মুখে শুনছি, গেরাম-দেশে আমাগো ঘরে সুন্দর মাইয়া জন্মাইলে তার কি আর নিজ জাতের মইধ্যে বিয়া-শাদী দিতে পারতাম? ছাশের জমিদার জোতদার বামুন-কায়স্থের পায়েই গিয়ে দিতে হইত সেই মাইয়ারে। মাইয়ারে 'রাখনী' দেওনের অভ্যাস আমাগো আছে, ভাইবেন না। বাপ হিসাবে আমার সন্তোষ এই, মাইয়াডা ভালো হাতেই পড়ছে।

যোগীন্দ্রর চিন্তার মধ্য দিয়ে এ আরেক দিগন্ত যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল আমার মনে। যে-জিনিষটা সহজেই আমি নিতে পারছিলাম, এতদিনে বুঝলাম, ওদের পক্ষে সে ব্যাপারটা সত্যিই সহজে নেওয়া সম্ভব নয়। সময় লাগবে। আমার আচার-আচরণ হয়ত একদিন সহজ করে দেবে ব্যাপারটা। লক্ষ্মী আমার নিকটতম সান্নিধ্যেই এসেছে, ঘুচে গেছে অহেতুক সংকোচ আর লজ্জা, কিন্তু তবু বুঝতে পারি, একটা অন্তরাল ও ঠিকই রেখে চলে। আমার সহধর্মিনী ও নিজেকে আজও ভাবতে পারে না, ভাবে আমার রক্ষিতা। এবং সেই হিসাবে যে অর্থ ও অলঙ্কারের দাবী থাকে মেয়েদের, সে দাবীও আবার ওর নেই।

অগত্যা আমিই মানিয়ে নিয়েছি ওদের সব। যোগীন্দ্র আজকালও সন্ধ্যায় এসে বসে অভ্যাস-মতো ঘরের মেঝের ওপরে। বলে, বাবুর খরচের ত অন্ত নাই। টান-টোন পড়লে লক্ষ্মীর কাছে থিক্যা চাইয়া নিবেন।

বললাম—তোমার উপার্জনের টাকা ত? ও তো আমার হাতবাক্সেই ও রাখে। টান পড়লে আমাকে কি ও জানায় সবসময়? নিজেই বাজার টাজারের নিত্যখরচের জন্য নিয়ে নেয়।

যোগীন্দ্র বলল—বুড়া হইছি, তেমন খাটতে পারি না। নইলে ঝুড়ি-চাটাই বেশী করে বুনতে পারলে হাতে টাকা কিছু আসে।

বললাম—মন্দ বলো নি। এরপরে হয়ত আমাদের সবাইকে মিলে ঝুড়ি-চাটাই বুনতে হবে।

যোগীন্দ্র একটু হাসল, বলল—বোনে ত! সরস্বতী ত আমার লগে লগে আছেই, লক্ষীও সময় পাইলে আইস্যা বসে।

বললাম—আমাকেও বসতে হবে দুদিন পরে। এ-চাকরী আমার থাকবে না। তোমাকে তাহলে কথাটা বলি। কাল আমার বদলির চিঠি এসে গেছে। মাসখানেক পরেই চলে যেতে হবে আমাকে পাহাড়ে, গয়াবাড়ী বলে একটা যায়গা আছে, সেখানে। দার্জিলিং

যেতে পথে পড়ে—গয়াবাড়ী। অনেক চা-বাগান আছে সেখানে। সাহেবের নিজের বাগান আছে, সেই বাগান দেখাশুনা করতে হবে। ছিল তামাক, এবার হলো—চা।

যোগীন্দ্র বললে—তার আর ভাবনা কী! যাইবেন।

—না যোগীন্দ্র,—বলে উঠলাম ওখানেও অশান্তি আরম্ভ হয়েছে। আসামের মতো না হয়!

মুখখানা পাংশু হয়ে গেল মুহূর্তে, কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালো যোগীন্দ্র, বললে—কী কইলেন বাবু! না-না তয় যাইবেন না, আমার মাইয়াগো উপর আর অত্যাচার আমি সইতে পারুম না! আর, অরাও বা কতো সইব, বলেন? সরস্বতী ত আজও ভাবতে পারে না, তার কানু আর বাইচ্যা নাই।

একটুক্ষণ থেমে থেকে বললাম—ঠিক এই সব কথাই ভাবছি। চাকরীই ছেড়ে দেবো ভাবছি!

যোগীন্দ্র বললে—কষ্ট পাইবেন আপনে যতদিন না নূতন চাকরী পান।

বললাম—নতুন চাকরী পাবার আর আশা রাখি না।

যোগীন্দ্রর গলাটা এবার কথা বলতে গিয়ে ধরে এলো, বলল—সবই আমার কপাল বাবু। এই জন্যই কয়েছিলাম, পাগলের হাত ধইরা আমি চইল্যা যাই, আমাগো ছাইরা দ্যান। লক্ষ্মী আমার লক্ষ্মী, অরে লইয়া ভাবনা নাই।

বললাম—না যোগীন্দ্র, তোমাদের দুজনকে আমি ছাড়বো না। কিছুতেই না। আমরা চারজন এক ভাগ্য সুত্রে গেঁথে গেছি। দেখা যাক কী হয়। আমি আজ চিঠি লিখে দিলুম, আমি বিয়ে করেছি, এখন আমার পক্ষে বদ্‌লি হয়ে পাহাড়ের নির্জনে গিয়ে থাকা সম্ভব নয়।

যোগীন্দ্র বললে—বাবু কি কইলকাত্তা যাইবেন বইলা ভাবছেন?

চুপ করে রইলাম। কলকাতায় আমার ছুটিতে ছুটিতে যাওয়ার

অভ্যাস ছিল। কিন্তু কলকাতায় মানুষগুলির সঙ্গে আমাদের নাড়ির যোগ বুঝি ছিন্ন হয়ে গেছে। সেখানে, তাদের সঙ্গে, আমি নির্ঘাৎ হাঁপিয়ে উঠব! কিন্তু, এসব কথা ত আর যোগীন্দ্রকে বলা যায় না, বোঝানোও যায় না।

যোগীন্দ্র আমাকে নিরুত্তর দেখে নিজেও চুপচাপ ভাবতে লাগল। লোকটি পুঁথি পড়েনি, কিন্তু জীবনের পাঠ নিয়েছে। মাঝে মাঝে ওর কণ্ঠে অভাবিত রূপে অদ্ভুত সত্যবাণী জেগে ওঠে। এবারেও তাই হলো। ও বললে—বাবু মানুষ যেখানেই যাবে, সকাজ গইড়্যা উঠবে। সমাজ গড়লেই জাত বেজাত থাকবে, উঁচু নীচু থাকবে, হিংসা মারামারি থাকবে। কইলকাত্তায় গেলে আপনার বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয়রা আপনারে ছি ছি করবে আমার মাইয়ারে লইয়া। আপনি কোথায় শান্তি পাইবেন? সেইজন্য কইছিলাম, কজটা ভালো করেন নাই। আমরা বাঁচছি, কিন্তু আপনে মর্‌ছেন।

— বলে উঠলাম -যোগীন্দ্র, তোমার কথা আমি মানতে পারলাম না। আমি মরিনি, দ্বিগুণ উদ্যম নিয়ে বেঁচে উঠেছি। আজ ইভান্সের কাছে গিয়ে তার হাতে-পায়ে ধরলে হয়, কিন্তু সেকথাটা ভাবতেই আমার ঘেন্না হচ্ছে। টাকা থাকলে ব্যবসা করতাম। এই তামাকের ব্যবসাই করতাম, যা ইভান্স করে।

—তাই করেন। কতো টাকা লাগব?

—অনেক টাকা। অন্ততঃ হাজার পাঁচ-ছয় না হলে কাজ আরাম্ভ করা যাবে না, তা যতো কৌশলই করা যাক না কেন?

ও বললে, তাইলে আমরা দিনরাত খাটতে আরম্ভ করি। টাকাটা কি আর জোগাড় হইব না!

অতি দুঃখেও হাসি এলো। বললাম—এতো সহজ, একমাসের মধ্যে পাঁচ হাজার টাকা রোজগার করা? দেখা যাক, অন্য কী করা যায়। অতো ভেবো না তুমি। না হয় কলকাতাতেই যাবো!

যোগীন্দ্র বললে—তা-ই যাইবেন, তবে লক্ষ্মীরে যেন দেশে নিজের

স্ত্রী বইলা পরিচয় দিবেন না। তাহলে, সকলে আপনার প্রাণ অতিষ্ঠ কইর‍্যা তুলব।

—তুলুক। বলে উঠলাম—তবু আমি লড়াই করে যাবো।

যোগীন্দ্র বললে—আপনের মতো মানুষ সত্যই কোনদিন দেখি নাই।

উঠে চলে গেল একটু পরেই। গেল চলে, কিন্তু রেখে গেল ওর চিন্তার প্রতিক্রিয়া। উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারী করতে লাগলাম। ওর একটি কথা বারে বারে কানে এসে বাজতে লাগল,—কোথায় যাইয়া শান্তি পাইবেন?

অসহিষ্ণু কণ্ঠে ডেকে উঠলাম—লক্ষ্মী, লক্ষ্মী?

লক্ষ্মী নয় সরস্বতী এসে দাঁড়ালো ঘরে। বললে—লক্ষ্মীরে ডাকো তুমি? ওর শরীলটা একটু খারাপ হইছে। পাকঘরের মেঝের উপরই আঁচল বিছাইয়া একটু শুইছে।

—সে কী!

ও একটু হাসল, বললে—অতো ডরাইয়া উঠ্যো না! বমি করতাছে কাল থিক্যা।

—সে কী! কী হয়েছে ওর?

সরস্বতীর ভাবভঙ্গী দেখে কে বলবে ওকে বিকৃতমস্তিষ্ক! বলে উঠল হাসতে হাসতে,—বুঝলা না? বাচ্চা হইব।

শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছিল ঠিক দশ মাস দশ দিন পরে। পুত্র-সন্তান। কিন্তু, ওর আবির্ভাব-দিবসের আগের এই দশ মাসের কাহিনী কি কম বিচিত্র?

চাকরী আমার ঠিক যায়নি এখনো। আমার চিঠির উত্তরে লিখল ইভান্স—অফিস-অর্ডার বদ্‌লানো যেতে পারে না। তোমাকে গয়াবাড়ী যেতে হবেই।

এর উত্তরে তৎক্ষণাৎই কিছু না লিখে দিনরাত ভাবতে

লাগলাম। আর খুঁজতে লাগলাম দৈনিক কাগজের কর্মখালির বিজ্ঞাপনমালা।

সরস্বতী একদিন সন্ধ্যার পর এলো হঠাৎ-ই বিধবার বেশ বদল করে। নীলাম্বরী শাড়ী পড়েছে, খোঁপায় ফুল। এসে বললে—ঝগড়া হইছে আজ লক্ষ্মীর সঙ্গে।

মুখ ফিরিয়ে তাকালাম ওর দিকে। বললাম—বাঃ! এইত বেশ দেখাচ্ছে।

ও বললে—দেখ, একটা স্বপ্ন দেখলাম কাল। দেখলাম, একটা লোক, চোখ দুইটা ভাঁটা মতন, মুখে দাড়ি, মনে হল আমার খুব চেনা, আমার কানুর মাথায় লাঠি মাইরা নিজেই কানুরে কোলে কইরা কান্‌তেছে! স্বপ্নটা ভাইঙা গেল, আর সারাটা দিন ধইরা ভাবতে লাগলাম। ভাবতে ভাবতে অনেক গুলান কথা মনে পইরা গেল। কানুর বাপ তা'হলে কে? আমিই বা বিধবা সাইজা বেড়াই ক্যান? লক্ষীরে গিয়া কইলাম—একখানা শাড়ী দে তোর, পরুম্। ও তো ফ্যালফ্যালাইয়া চাইয়া রইল। কইলাম, মা হইছি কিন্তু বিয়া আমার হয় নাই। আমি বিয়া করুম, আমি তোর লাখান ঘর করুম্। ক্যান, তোর সাধ আহ্লাদ থাকতে পারে, আমার নাই?

বেশ মনে আছে সেদিনকার কথা। যোগীন্দ্রকে ডেকে বলেছিলাম—ওর জ্ঞান কিন্তু অনেকটা ফিরে এসেছে। এসো, বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করি।

যোগীন্দ্র আমার মুখের দিকে নির্বোধের মতো তাকিয়ে ছিল অনেকক্ষণ। তারপর বলেছিল—বাবু, আপনারে দেইখ্যা মানুষের উপরে বিশ্বাস ফিরা আইছে, তবু কই, আপনার লাখান আর মানুষ পামু কই? ও মাইয়ার কথা আপনে ভাববেন না। যা দেখ্‌তাছেন, এইটাও ওর একটা খেয়াল। কোন্ দিন আবার সব ফেইল্যা ছুঁইড়া থান পইরা বসব।

—না—না। আর ওকে থান পরতে দিও না। সত্যিই ত, থান ও পড়বে কেন? কোন্ কলঙ্কের ভরে এই মিথ্যাচরণ?

চুপ করে ছিল।

লক্ষ্মী বললে—দিদির আবার মাথা খারাপ হইছে। রকমসকম দেখ না? চোখে মুখে কথা কয়।

বললাম—বিয়ে করতে চায় তোমার দিদি। কী গো, শেষ কালে যদি আমাকেই পছন্দ হয়ে যায়?

লক্ষ্মী বলে বসল—একই কথা। একজন 'রাখনী'র বদলে আরেকজন 'রাখনী' আসব। বাবুগোর ত এইসব হরদমই হইয়া থাকে।

চট্ করে চলে যায় ঘর থেকে। কথাটায় ব্যথা পাই মনে মনে। পরিহাসটা ধরতে পারল না বলে নয়, নিজেকে আজও সে 'অন্যকিছু' ভাবতে পারল না বলে।

এই নিয়ে খুব বেশী মাথা ঘামানোর অবকাশ তখন আমার ছিল না বললেই হয়। যোগীন্দ্রকে ডেকে বললাম—আলিপুরদুয়ার যাচ্ছি। কাজে। দেখো।

সাইকেলেই যাতায়াত। গিয়েছিলাম সেই আমাদের বন্ধুটির কাছে। সে হঠাৎ আমাকে একখানা চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছিল। বললাম—কী ব্যাপার? চিঠিতে ভেঙে ত কিছুই লেখো নি।

বললে—বসো একটু সুস্থ হয়ে। যে জন্য ডেকে পাঠিয়েছি, তা চিঠিতে অতো ভেঙে লেখা যায় না।

ওর ইজিচেয়ারটায় আরামে গা এলিয়ে দিয়ে বললাম—কী, বলো এবার।

বললে—আগে চা-টা আসুক?

—হবে'খন। আগে বলো।

বললে—তোমার সাহেব এসেছিল দিনকয়েক আগে।

—তারপর?

বললে—একবার দেখা করলেই সব সহজে মিটে যেতো।

দৃঢ়কণ্ঠে বললাম—না, তা হয় না।

বন্ধু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটুক্ষণ চুপ করে রইল, তার পরে বললে—যাই হোক, তোমার বদলি রদ করতে পেরেছি মনে হচ্ছে।

—আমার বদলির হুকুমের কথা জানতে?

—জানব না! বন্ধু বললে—সবই জেনেছি ইভান্সের মুখ থেকে।

—বলে যাও।

বন্ধু বলতে লাগল—সাহেবকে একটা চালের কথা বললাম। বলেই বুঝলাম, মোক্ষম অস্ত্র নিক্ষেপ করেছি এবার।

—কী বললে?

—বললাম, বললাম তোমারই কথা। বললাম—সে চাকরী ছেড়ে স্বাধীন ভাবে তামাকের ব্যবসা শুরু করছে। অভিজ্ঞ লোক, পার্টি সবই তার জানাশোনা, তোমার ব্যবসা ওখান থেকে গোটাতে হবে সাহেব!

বললাম—গোটাতেই কিন্তু চেয়েছিল।

বন্ধু বললে—পাগল! ক্যাপিটালিস্টদের এখনো চেনো নি? যাই হোক ব্যাপারটা এবার বুঝলে? ভয় পেয়ে গেছে। আর কি তোমাকে সরায়? সত্যিই ত, ওকে কে চিনত? চিনত ত সবাই তোমাকে! তোমাকে বাদ দিয়ে ওর ব্যবসা ওখানে চলতে পারে? এবার গিয়েই দেখবে, চিঠির সুর নরম হয়ে গেছে!

বন্ধুর কথা অতঃপর ছ'মাসের মধ্যে অক্ষরে-অক্ষরে ফলে গিয়েছিল। যোগীন্দ্রকে বললাম—চাকরী তাহলে গেল না।

যোগীন্দ্র বললে—আমি তা জানতাম বাবু। আমার ভয় সেদিকে না বাবু, আমার ভয় এইখান থিক্যা আবার না তাড়াইয়া দেয়; কোনটা যে আমাগো হ্যাশ নয়, সবই যেন গোলমাল হইয়া যাইতেছে।

যোগীন্দ্র আরও একটা কথা বলেছিল—ভাষা যদি এক হওনের

লাগে ত, আমাগো গাঁয়ের ভাষা ত বেবাকই এক ছিল, বাঙলা ভাষাই ত কইতাম! তয় পাকিস্তান হইল ক্যান্? নিজের মনেই প্রবোধ দিল্যাম, হিন্দুগো স্থাশ, আর মুসলমানগো স্থাশ আলাদা হইয়া গেল। আইলাম আসাম, সেখানে ত বেবাকই হিন্দু, তয় আমার মাইয়ার উপর লাঞ্ছনা হইল ক্যান, নাতিই বা মারা পড়ল ক্যান? আহা! মাইয়াটা কাইলও 'কানু-কানু' বইল্যা পা ছড়াইয়া বইস্যা কান্দছে।

উত্তর দেবার কি ছিল? শান্তির ললিতবাণী এখন ব্যর্থ পরিহাস শোনাবে। বহুদিন পরে আমার নক্ষত্রলোক নিয়ে আবার সে-রাত্রে নিবিষ্ট হয়ে পড়েছিলাম।

আর তারপরে, দিন কাটতে লাগল, দিনের পর দিন। দশ মাস দশ দিন। লক্ষ্মীকে নিয়ে যেতে হলো আলিপুরদুয়ারের হাসপাতালে। দিন সাত আট পরেই ফিরে এলো শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে। ছেলেটি সুন্দরই হয়েছে, দিব্যি ফুটফুটে আর স্বাস্থ্যবান। লক্ষ্মীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম—কী গো। এইবার?

ওর চোখে মুখে লজ্জার ছায়াপাত। ভ্রূ কুঁচকে কপট তিরস্কারের ভঙ্গীতে বলে—কী এইবার?

—ছেলের কী পরিচয় দেবে? আমার পরিচয়ই ত? না বলবে, ওর আইন সম্মত পিতৃপরিচয় নেই, ও এক রক্ষিতার সন্তান?

—ছি ছি। কী যে কও!—লক্ষ্মী বললে, আমারে খেপাইয়া কী যে সুখ পান! ডাকেন দেখি মশাই দিদিরে? দিদির কোলে ছেলেরে শোয়াইয়া দিই, বলি, তার কানুই ফিরা আইছে।

ওকে কোলে নিয়ে সত্যিসত্যি সরস্বতী 'কানু-কানু' করে কেঁদে অস্থির হলো। আর আশ্চর্য, ওর সব স্মৃতি বুঝি ফিরে এলো সঙ্গে সঙ্গে। বললে—আমার কানুই আস্‌ছে। মায়ের কোল তখন পছন্দ হয় নাই, এইবার আইছে মাসীর কোলে নতুন শরীর লইয়া। ওরে দিয়া দিবি রে লক্ষ্মী আমারে?

লক্ষ্মী বললে—ও তো তোমারই দিদি, তুমিই ওকে মানুষ করো।

যোগীন্দ্রকে ডেকে বললাম—তুমি খুশী হয়েছ ত নাতির মুখ দেখে?

—হ বাবু।

বলে উঠলাম—আবার 'বাবু'? আমাকে 'জামাই' বলে মেনে নিতে না হয় পারলে না, কিন্তু, নাতি যখন আর একটু বড়ো হয়ে 'দাদু' বলে ডাকবে, তখন কি মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারবে?

বৃদ্ধ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। নাতিকে কোলে নিয়ে আমার মুখের দিকে তাকালো, বললে—ভাবছিলাম, লক্ষ্মীরে বিয়ে করলা, সে তোমার দুদিনের শখ। দুদিন যাবে, আমার যে-লক্ষ্মী, সে-লক্ষ্মীই হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু, তুমি বাবা, এত শক্তি পাইলে কোথা হইতে? এক কথায় সমাজ সংসার সব তুচ্ছ হইয়া গেল তোমার কাছে?

চোখদুটো আমারও তখন ভিজে উঠেছে। কেন যেন এই সময় বার বার আরেকজনের কথা মনে হতে লাগল। সে একজন আমারই বোন— অতসী। আকাশের কোন স্তর থেকে সে বুঝি তার আনন্দের ধ্বনি-তরঙ্গ আজও প্রেরণ করছে—সেজদাগো, সেজদা!